সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জানুয়ারি ২০২২

১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে
ইন্ডিয়া গেটে বসছে
নেতাজির গ্রানাইট মূর্তি

৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

২৬ জানুয়ারি ২০২২ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন তার নিজস্ব চ্যান্সেরি প্রাঙ্গণে ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন করে। হাই কমিশনার শ্রী বিক্রমকুমার দোরাইস্বামী জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতির উদ্দেশে দেয়া মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ পাঠ করেন। ঢাকায় অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকবৃন্দ কোভিডবিধি অনুসরণ করে প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৫০ | সংখ্যা ০১ | পৌষ-মাঘ ১৪২৮ | জানুয়ারি ২০২২

High Commission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /hcidhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

সম্পাদক
নান্টু রায়
ফোন: ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২৩৯
e-mail: inf4.dhaka@mea.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা

ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই। এ পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

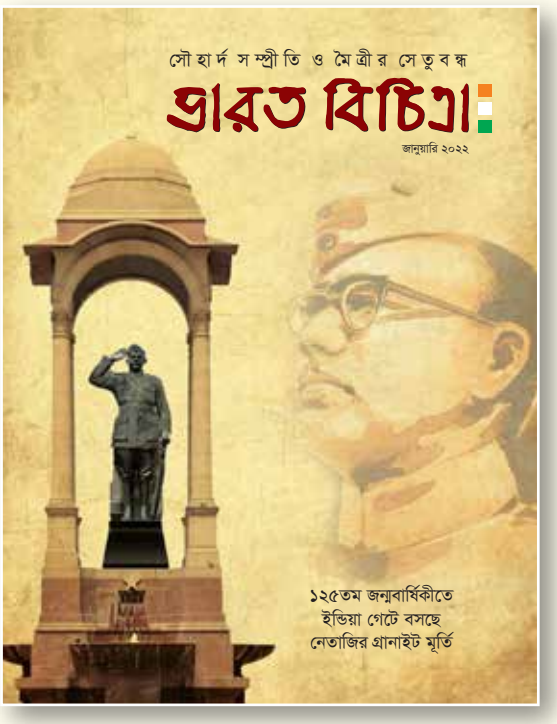

০৬-০৭ | যুবদিবস
স্বামী বিবেকানন্দ স্মারকদিবস

সনাতন সন্ন্যাসী, দার্শনিক, লেখক, সংগীতজ্ঞ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদী ধর্মীয় গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্তের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর জন্মদিবস ভারতে যুবদিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে সনাতন ধর্ম তথা ভারতীয় বেদান্ত ও যোগ দর্শনের প্রচারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অনেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন এবং সনাতন ধর্মকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসেবে প্রচার করার কৃতিত্ব বিবেকানন্দকে দিয়ে থাকেন। ভারতে হিন্দু পুনর্জাগরণের তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাটি প্রবর্তন করেন।

০৮-০৯ | স্মরণাঞ্জলি/১
গভর্নরের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ভণ্ডুল করে দিলেন নেতাজি

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় সুভাষ সকলের মন জিতে নিলেন। বোঝালেন, অসমে কোনওভাবেই মুসলিম লীগের সরকার গড়তে দেওয়া চলবে না। বোঝালেন, ধর্মের ভিত্তিতে ক্ষমতা দখল, বিভাজন বা রাজ্য শাসন মোটেই এখানকার সংস্কৃতি বা আদর্শ হতে পারে না। এই বিভাজন নীতির পিছনে যে ইংরেজদের প্রচ্ছন্ন মদত রয়েছে। অসমের গভর্নর মন্ত্রিসভা গঠন স্থগিত রেখে বেআইনি কাজ করছেন। সরকারপক্ষ পদত্যাগ করলে বিরোধীকে সরকার গড়তে ডাকাই দস্তুর।

১০ | শ্রদ্ধাঞ্জলি/১

১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে ইন্ডিয়া গেটে বসছে নেতাজির গ্রানাইট মূর্তি

দেশনায়কের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনকে স্মরণীয় করে রাখতে একাধিক উদ্যোগ নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ বছর দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা বর্ষে বছরভর পালিত হচ্ছে 'আজাদি কি অমৃত মহোৎসব'। জোড়া উদ্‌যাপন শুরু হয়েছে ২৩ জানুয়ারি ২০২২ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন থেকেই। তার ঠিক দু'দিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে নেতাজির সুদীর্ঘ গ্রানাইটের মূর্তি স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন। যতদিন তা তৈরি না হয়, ততদিন পর্যন্ত থাকবে একটি 'হলোগ্রাম স্ট্যাচু'।

১১ | শ্রদ্ধাঞ্জলি/২

সুভাষ-জীবনের নানা অধ্যায় নিয়ে অনলাইন প্রদর্শনী

১২-১৩ | স্মরণাঞ্জলি/২

প্রতিবাদী রাজনীতির স্ফুলিঙ্গ ছিল নেতাজির আইএনএ

রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছিল তাঁদের মধ্যে। তা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধী নেতাজিকে সম্বোধন করতেন 'দেশপ্রেমিকদের দেশপ্রেমিক' বলে। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে নেতাজির অনমনীয় সংগ্রাম, এক ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক এবং স্বাধীন ভারতের লক্ষ্যে তাঁর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আইএনএ) গঠনের কাহিনি অনেক শোনা। কিন্তু পাশাপাশি এও ফিরে ভাবা প্রয়োজন, কীভাবে আইএনএ ১৯৪৫-৪৬ সালের ভারতের ভিতর এক প্রতিবাদী রাজনীতির জন্ম দিয়েছিল, যা উপমহাদেশের ক্ষমতা হস্তান্তরকে ত্বরান্বিত করে।

১৪ | বিশেষ রচনা

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগ

১৫-২৩ | ভ্রমণ

বিশ্ব পর্যটন ক্ষেত্রে ভারত হয়ে উঠছে বিবিধের মাঝে মহামিলন তীর্থ

১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর যশোর জেলা পাক হানাদার বাহিনী মুক্ত হয়েছিল। এদিন দুপুরের পরপরই যশোর সেনানিবাস ছেড়ে পালিয়ে যায় পাক হানাদারবাহিনী। প্রথম শত্রুমুক্ত হয় যশোর জেলা। যশোরেই প্রথম উঠেছিল বিজয়ী বাংলাদেশের রক্ত সূর্যখচিত গাঢ় সবুজ পতাকা। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স-মুজিব বাহিনীর (বিএলএফ) বৃহত্তর যশোর জেলার (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল) উপ-অধিনায়ক রবিউল আলম জানান, '৭১ সালের ৩, ৪ ও ৫ ডিসেম্বর যশোর অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ সময় মিত্রবাহিনীও সীমান্ত এলাকা থেকে যশোর সেনানিবাসসহ পাক আর্মিদের বিভিন্ন স্থাপনায় বিমান হামলা ও গোলা নিক্ষেপ করে।

১৮ | ই-ভিসার কারণে পর্যটকের সংখ্যাবৃদ্ধি

১৯ | কোভাদিয়া: বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের প্রতীক

২০ | দ্রুত যোগাযোগের ওপর গুরুত্বারোপ

২১ | উড়ান স্কিম পর্যটনের গতি বাড়িয়েছে

২১ | স্বদেশ দর্শন: ভারতের বৈচিত্র্য সংরক্ষণের একটি উদ্যোগ

২২ | প্রসাদ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিকাঠামো উন্নয়ন

২৩ | তথ্য ও হেল্পলাইন

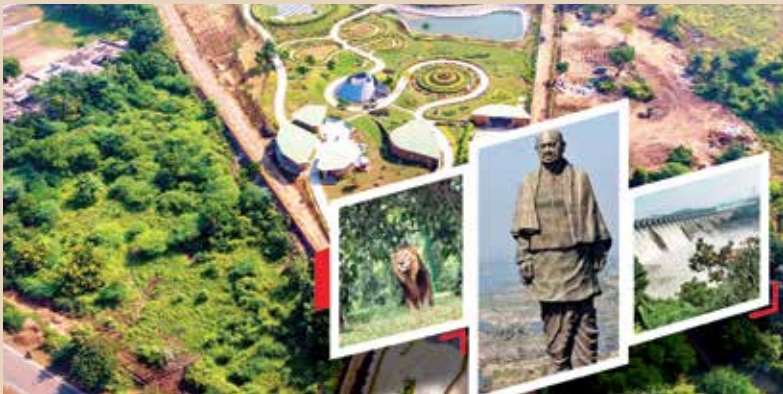

২৪-২৫ | কবিতা
সোহরাব পাশা, এস এম তিতুমীর, শেলী সেনগুপ্তা, ইলিয়াস বাবর, গাফ্‌ফার মাহমুদ, মিতুল সাইফ, রনি অধিকারী ও শৈলজানন্দ রায়

২৬-২৭ | ছোটগল্প
তন্বী তমালিকা
তাল-তরমুজে তারাগঞ্জ তরতাজা। তাতে ত্রিবেদীদের তাঁবু। ত্রৈলোক্যনাথ ত্রিবেদী তারাগঞ্জের তারকেশ্বর ত্রিবেদীর তনয়। তারকেশ্বর ত্রিবেদী তর্করত্ন। তিনি তারাপতির তপস্যায় ত্রিবেণীর তীরবর্তী তপোবনে তপস্যারত। তপোবলে তিনি তাপস। ত্যাগে ততধিক তন্ময়। তিরানব্বই-এ তিনি তিরোহিত। তাঁরই তনয় ত্রৈলোক্যনাথ ত্রিবেদী।
ত্রৈলোক্যনাথ তৎকালীন তড়িৎশক্তির তত্ত্বাবধায়ক। তড়িৎশক্তির তত্ত্বাবধানে তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি। তথ্যানুসন্ধানের তদারকিতেও তিনি তৎপর। তেলকুচকুচে তনু, তবুও তিনি ত্যাগী। ত্যাগেই তাঁর তৃপ্তি। তৃষ্ণা তার তৃণ-লতার তদারকিতে, তন্ময়তা তাল-তমালে। তরতাজা তরুরাজির তারুণ্যে তিনি তুষ্ট। তুষ্ট তিনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ তৃণভোজীদের তুষ্টিতেও।

২৮ | বিজ্ঞান
সূর্যের নিকটতম প্রতিবেশী
সূর্যের নিকটতম প্রতিবেশীকে খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। দক্ষিণ গোলার্ধের চিলি থেকে তাঁরা একটা বিশেষ ধরনের দূরবীন ব্যবহার করে অস্থিত্ব নির্ণয় করেছেন সেই প্রতিবেশীর। এটি একটি এস্টেরয়েড বা গ্রহাণু। আর এর আপাতত নামকরণ করা হয়েছে 2021PH27।

২৯-৩১ | ছোটগল্প
সূর্য যখন বুঝতে পারল
সূর্য একজন জ্বলজ্বলে ছেলে। এতসব ভাবনা ওর মাথার ভেতরে কাজ করে যে, ও রাতে ঘুমাতে পারে না। প্রথম ভাবনা– আমাদের দেশটা কবে আরও সুন্দর হবে। যেমন সে দেখে পশ্চিমের দেশ। দেখে ছবিতে, টেলিভিশনে, সিনেমায়, বইতে। এখনও বিদেশে যাওয়া হয়নি। বাবা মোহসিন ছোটখাটো একটা কাজ করেন। কোনও এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ছোট একজন কেরাণি, যিনি একটিমাত্র পুত্রকে নিয়ে টেনেটুনে সংসার চালান। স্ত্রী মরিয়ম বি এ পর্যন্ত পড়েছিল। পাশ করেনি। বিএ পাশ হলে সেও না হয় সংসারের হাল ধরত। আরও একটা ছোটখাটো কেরাণির কাজ সংগ্রহ করত।

৩২-৩৩ | ব্যক্তিত্ব/১
মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) বাংলা সাহিত্যের মহাকবি, নাট্যকার, বাংলাভাষার সনেট প্রবর্তক, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে, এক জমিদার বংশে তাঁর জন্ম। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন কলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল। মা জাহ্নবী দেবীর তত্ত্বাবধানে মধুসূদনের শিক্ষারম্ভ হয়। প্রথমে তিনি সাগরদাঁড়ির পাঠশালায় পড়াশোনা করেন। পরে সাত বছর বয়সে তিনি কলকাতা যান এবং খিদিরপুর স্কুলে দু'বছর পড়ার পর ১৮৩৩ সালে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শেখেন।

৩৩ | ভারতবিষয়ক কুইজ
আচ্ছা, বলুন তো?

৩৪-৩৫ | প্রবন্ধ

বহু ভাষাবিদ জনপ্রিয় লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী

শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯০৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ভারতে আসামের অন্তর্গত সিলেটের করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ সিকান্দর আলী ছিলেন সাব-রেজিস্ট্রার। পিতার নিবাস ছিল হবিগঞ্জের উত্তরসুর গ্রামে। চাকরিসূত্রে পিতার কর্মস্থল পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নের পর মুজতবা আলী শেষপর্যন্ত শান্তিনিকেতন-এ ভর্তি হন এবং পাঁচ বছর অধ্যয়ন করে ১৯২৬ সালে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

৩৬-৩৮ | ছোটগল্প

চা

থরো চেক-আপের সমস্ত রিপোর্টে দ্রুত চোখ বোলাতে বোলাতে ডক্টর সোম গম্ভীরভাবে ব্রহ্মাস্ত্রটা নিক্ষেপ করে দিলেন, 'চা খাওয়াটা একেবারে বন্ধ করুন এবার।' উল্টো দিকে উদ্বিগ্ন মুখে বসে থাকা কর্ণ সেন যে তখন প্রকৃতই অভিশপ্ত কর্ণের মত মোক্ষম সময়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার সমস্ত কৌশল ভুলে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন, তা খেয়ালই করলেন না ডাক্তারবাবু। 'চায়ে চিনি খান?' দ্বিতীয় তির। 'হ্যাঁ, মানে চায়ে তো অল্প চিনি...'

৩৮ | নিবন্ধ

পরাজিত মানিক

প্রজন্মের অনেক 'স্যার' লেখক এসেছেন, আরও আসবেন। কিন্তু এমন মৃগীরোগী ছন্নছাড়া জেদী মানিক একটাই, কেবল একটাই। আপনাকে ভালবাসি, মানিক। আমাদের ভালবাসা গ্রহণ করুন।

৩৯ | ব্যক্তিত্ব/২

শ্রীনিবাস রামানুজন

শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে ফলাফল কী হবে? শ্রেণিকক্ষে এই প্রশ্নটি করেছিল এক ছাত্র। প্রশ্ন শুনে শিক্ষক হতবাক হয়ে যান এবং ছাত্ররা হাসতে থাকেন। কিন্তু এই প্রশ্নটি গণিতের সবচেয়ে কঠিন ধাঁধার সমাধানের পথ তৈরি করেছিল; যার উত্তর তখন পর্যন্ত সারা বিশ্ব খুঁজে চলেছিল। প্রশ্নকর্তা ছাত্রটি হলেন শ্রীনিবাস রামানুজ, যার গাণিতিক নীতিগুলো নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে।

৪০-৪২ | বিশেষ ধারাবাহিক

শোক

শেষ হল সালাম আজাদের রবীন্দ্রজীবনভিত্তিক রচনা...

৪৩-৪৪ | চলচ্চিত্র/১

সুচিত্রা সেন: বাঙালির স্বপ্নের নায়িকা

রমা দাশগুপ্ত ছিল তাঁর পারিবারিক নাম। ১৯৬৩ সালে সাত পাকে বাঁধা চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে সুচিত্রা সেন 'সিলভার প্রাইজ ফর বেস্ট অ্যাকট্রেস' জয় করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় অভিনেত্রী যিনি কোনও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মান প্রদান করে। শোনা যায়, ২০০৫ সালে তাঁকে 'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার' দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল; কিন্তু সুচিত্রা সেন জনসমক্ষে আসতে চান না বলে এই পুরস্কার গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন।

৪৫-৪৭ | চলচ্চিত্র/২

ভারত এখন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র নির্মাণ কেন্দ্র

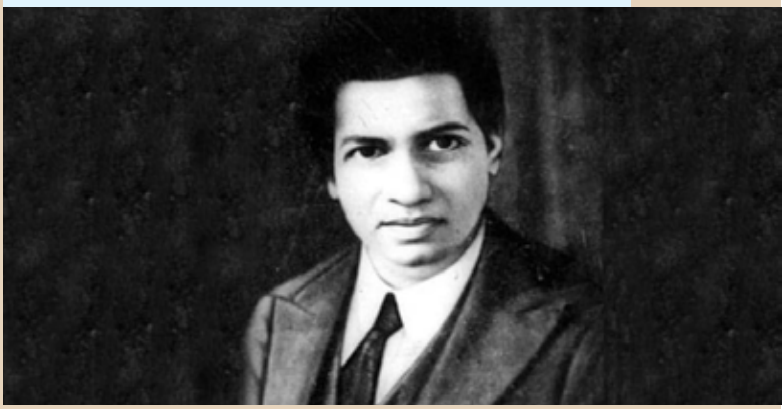

সম্পাদকীয়

দেখতে দেখতে আরেকটা নতুন বছরে পা রাখল পৃথিবী। কিন্তু নতুন বছরটাকে স্বাগত জানাতে হল নিতান্ত বিষাদপূর্ণ পরিবেশে, তার শরীরে অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে মহামারীর ক্ষত, লক্ষ-কোটি মানুষের মৃত্যুর হাহাকার। এ কেমন নতুন বছর, এ কেমন নতুন সকাল! কোভিড-১৯-এর হানা কুড়ি ছাড়িয়ে, একুশ পেরিয়ে বাইশে অব্যাহত রয়েছে। প্রথমে একে আমরা করোনা নামে অভিহিত করেছিলাম, পরের সংস্করণের নাম ছিল ডেল্টা, তৃতীয় সংস্করণের নাম অমিক্রন, এ সম্পাদকীয় যখন লিখছি, অমিক্রনের দ্রুত বিস্তারী সংক্রমণে পৃথিবীর তখন বিপর্যস্ত দশা। বিজ্ঞানীরা আশংকা করছেন, খুব শিগগিরই নাকি কোভিড-১৯-এর চতুর্থ সংস্করণ হানা দেবে পৃথিবীতে, আর তার ভয়াবহতা নাকি অতীতের যে-কোনও সংস্করণকে ছাড়িয়ে যাবে। চতুর্থ সংস্করণের এই সংক্রামকের আতুড়ঘর সেই উহান, চিনের যে প্রদেশে এ মহামারীর প্রথম উৎপত্তি ঘটেছিল। ইতোমধ্যে পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহল নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা আর অক্লান্ত পরিশ্রমে কোভিড-১৯-এর করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছেন, মনুষ্যদেহে তার প্রয়োগ শুরু হয়েছে। ফল খুব আশাপ্রদ না হলেও পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ সে টিকা গ্রহণ করেছেন, করছেন, ভবিষ্যতেও করবেন। স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞদের আশংকা, করোনার বিরুদ্ধে প্রতিষেধকের দেয়াল তোলা গেলেও একে চিরতরে হয়তো নির্মূল করা সম্ভব হবে না। হতাশার এমন অমানিশায় আমরা শুধু প্রার্থনাই করতে পারি। নতুন বছরে আমাদের প্রার্থনা, পৃথিবী করোনামুক্ত হোক। পৃথিবী নিরাময় হোক।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ১২ জানুয়ারি ভারতে যুবদিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে সনাতন ধর্ম তথা ভারতীয় বেদান্ত ও যোগ দর্শনের প্রচারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অনেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন এবং সনাতন ধর্মকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসেবে প্রচার করার কৃতিত্ব বিবেকানন্দকে দিয়ে থাকেন। ভারতে হিন্দু পুনর্জাগরণের তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাটি প্রবর্তন করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা তাঁর মহত্তম কীর্তি। বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহামারী-আক্রান্ত পৃথিবীর মানবমণ্ডলীর সেবায় এগিয়ে আসুন, মানবসভ্যতাকে রক্ষা করুন।

যুবদিবস

স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক দিবস

সনাতন সন্ন্যাসী, দার্শনিক, লেখক, সংগীতজ্ঞ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদী ধর্মীয় গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্তের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর জন্মদিবস ভারতে যুবদিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে সনাতন ধর্ম তথা ভারতীয় বেদান্ত ও যোগ দর্শনের প্রচারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অনেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন এবং সনাতন ধর্মকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসেবে প্রচার করার কৃতিত্ব বিবেকানন্দকে দিয়ে থাকেন। ভারতে হিন্দু পুনর্জাগরণের তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাটি প্রবর্তন করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা তাঁর মহত্তম কীর্তি। তার সবচেয়ে বিখ্যাত বক্তৃতাটি হল, ‘আমেরিকার ভাই ও বোনেরা...’।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় প্রদত্ত চিকাগো বক্তৃতা, যার মাধ্যমেই তিনি পাশ্চাত্য সমাজে প্রথম হিন্দুধর্ম প্রচার করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতার এক উচ্চবিত্ত হিন্দু বাঙালি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছোটোবেলা থেকেই আধ্যাত্মিকতার প্রতি তিনি আকর্ষিত হতেন। তার গুরু রামকৃষ্ণ দেবের কাছ থেকে তিনি শেখেন, সকল জীবই ঈশ্বরের প্রতিভূ; তাই মানুষের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর বিবেকানন্দ ভারতীয় উপমহাদেশ ভালোভাবে ঘুরে দেখেন এবং ব্রিটিশ ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেন। পরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় ভারত ও হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও ইউরোপে তিনি হিন্দু দর্শনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অসংখ্য সাধারণ ও ঘরোয়া বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ক্লাস নিয়েছিলেন। তার রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত, ভারতে বিবেকানন্দ, ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী (কবিতা-সংকলন), মদীয় আচার্যদেব ইত্যাদি। বিবেকানন্দ ছিলেন সংগীতজ্ঞ ও গায়ক। তার রচিত দুটি বিখ্যাত গান হল 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন' (শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক ভজন) ও 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি'। এছাড়া 'নাচুক তাহাতে শ্যামা', '৪ জুলাইয়ের প্রতি', 'সন্ন্যাসীর গীতি' ও 'সখার প্রতি' তার রচিত কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা। 'সখার প্রতি' কবিতার অন্তিম দুইটি চরণ–

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?/ জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' বিবেকানন্দের সর্বাধিক উদ্ধৃত একটি উক্তি। ভারতে বিবেকানন্দকে 'বীর সন্ন্যাসী' নামে অভিহিত করা হয়।

১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণকারী এই নবীন সন্ন্যাসী ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। স্বামী বিবেকানন্দ আজও কোটি কোটি যুবকদের অনুপ্রাণিত করে চলেছেন। আসুন জেনে নিই তার কিছু চিন্তাভাবনা এবং জীবনের উৎস এবং অনুপ্রেরণামূলক চিন্তা যা জীবনে শক্তি যোগায়।

এক নজরে বিবেকানন্দ

- জন্ম: ১২ জানুয়ারি ১৮৬৩, কলকাতা, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ব্রিটিশ ভারত (অধুনা কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতীয় প্রজাতন্ত্র)
- মৃত্যু: ৪ জুলাই ১৯০২ (বয়স ৩৯), বেলুড় মঠ, হাওড়া, হাওড়া জেলা, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ব্রিটিশ ভারত (অধুনা বেলুড় মঠ, হাওড়া, হাওড়া জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতীয় প্রজাতন্ত্র)
- জাতীয়তা: ভারতীয়।
- প্রতিষ্ঠাতা: রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ মঠ।
- গুরু: রামকৃষ্ণ।
- দর্শন: অদ্বৈত বেদান্ত, রাজযোগ।
- সাহিত্য কর্ম: রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, মদীয় আচার্যদেব, ভারতে বিবেকানন্দ।
- বিশিষ্ট শিষ্য (সমূহ): অশোকানন্দ, বিরজানন্দ, পরমানন্দ, আলাসিঙ্গা পেরুমল, অভয়ানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, সদানন্দ।

প্রভাবান্বিত ব্যক্তিবর্গ

সুভাষচন্দ্র বসু, অরবিন্দ ঘোষ, বাঘা যতীন, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, জওহরলাল নেহরু, বাল গঙ্গাধর তিলক, জামশেদজি টাটা, নিকোলা টেসলা, সারা বার্নহার্ড, এমা কাভ, জগদীশচন্দ্র বসু, অ্যানি বেসান্ত, রম্যা রোলাঁ, এ পি জে আব্দুল কালাম, নরেন্দ্র মোদী, আন্না হাজারে।

তাঁর অনুপ্রেরণামূলক চিন্তা

১. আপনি যে সময়ই সংকল্প করেন, সেই সময়েই কাজটি সম্পূর্ণ করুন, অন্যথায় মানুষ আপনাকে বিশ্বাস করবে না।

২. জীবনে অনেক সম্পর্ক থাকা জরুরি নয়, তবে যে সম্পর্কে আছে তাতে প্রাণ থাকা দরকার।

৩. দিনে একবার নিজের সঙ্গে কথা বলো, অন্যথায় আপনি বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হারাবেন।

৪. হৃদয় ও মাথার দ্বন্দ্বে সর্বদা আপনার হৃদয়ের কথা শোনো।

৫. নিজেকে কখনই দুর্বল ভেবো না, কারণ এটাই সবচেয়ে বড় পাপ।

৬. ওঠো, জাগো এবং যতক্ষণ লক্ষ্য অর্জন না হয় তত ক্ষণ পর্যন্ত থেমো না।

৭. সংগ্রাম যত বড় হবে, বিজয়ও তত গৌরবময় হবে।

৮. মানুষ তোমার প্রশংসা করুক বা সমালোচনা করুক, লক্ষ্য তোমার প্রতি সদয় হোক বা না হোক, তুমি আজ মৃত্যুবরণ করো বা কয়েকযুগ পর, কখনই ন্যায়ের পথ থেকে সরে যেও না।

শিক্ষার্থীদের জন্য তাঁর উপদেশ

১. পড়ার জন্য মনোযোগ প্রয়োজন, একাগ্রতার জন্য মনোযোগ প্রয়োজন। শুধুমাত্র ধ্যানের মাধ্যমেই আমরা ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রেখে একাগ্রতা অর্জন করতে পারি।

২. জ্ঞান নিজের মধ্যেই বিদ্যমান, মানুষ কেবল এটি আবিষ্কার করে।

৩. ওঠো, জাগো এবং যতক্ষণ লক্ষ্য অর্জন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত থেমো না।

৪. যতদিন বাঁচবে ততদিন শিখবে। অভিজ্ঞতাই হল বিশ্বের সেরা শিক্ষক।

• সংগৃহীত

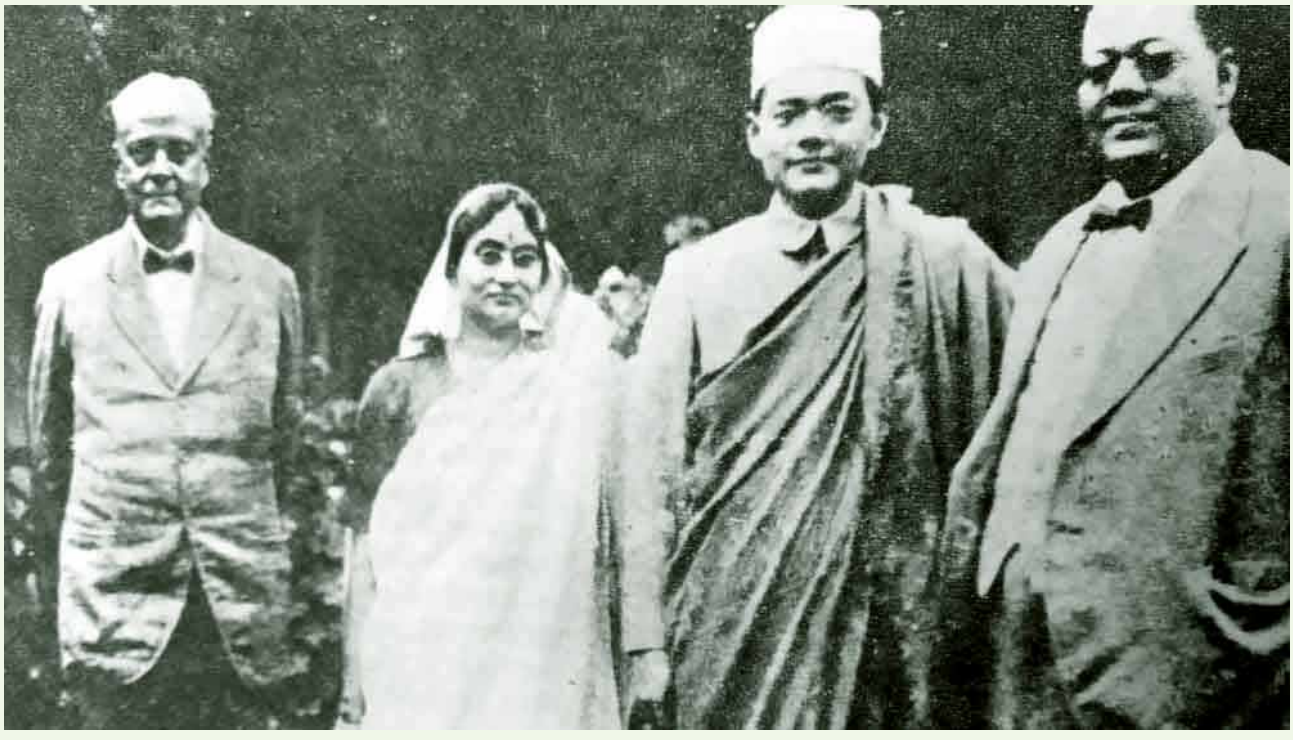

শিলংয়ে দাদা শরৎচন্দ্র ও বৌদি বিভাবতী দেবীর মাঝে সুভাষচন্দ্র বসু। একেবারে বাঁ দিকে, তাঁর বাবা জানকীনাথ বসু

স্মরণাঞ্জলি/১

গভর্নরের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ভণ্ডুল করে দিলেন নেতাজি

অসমে সাম্প্রদায়িক জটিলতায় কোণঠাসা কংগ্রেস। ছুটে গেলেন সুভাষচন্দ্র। মানুষকে বোঝালেন, ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন অনুচিত। সকলের সমানাধিকার মেনেই তৈরি হোক মন্ত্রিসভা। প্রবল জনসমর্থনে পিছু হটলেন বিরোধীরা।

চিত্র ১:

‘যদি দেশপ্রেম ও টেররিজম সমার্থক হয়, তবে আমাকে টেররিস্ট বললে আমি আপত্তি করব না। হ্যাঁ, আমি একজন দেশপ্রেমিক... আমাদের দেশ কেন অন্য জাতির পদানত থাকবে?... আমি পরিষ্কার বলছি, দরকার হলে আমাদের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে নামতে হবে। আমাদের দেশ আমরাই শাসন করব এবং সেটাই স্বাভাবিক...’

সময়টা ১৯৩৮ সালের শরৎকাল। অবিভক্ত অসমে সদ্য কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা গড়েছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। রুখে দিয়েছেন মুসলিম লীগের চক্রান্ত। শাণিত যুক্তিতে খণ্ডন করছেন ব্রিটিশের বিভাজন ও দমন নীতি। সরকারি নজর সর্বক্ষণ তাঁর ভাষণে, চিঠিপত্রে। সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি তিনি। সেই অবস্থায়, শিলংয়ের সেন্ট এডমন্ড কলেজের সভাগৃহে গর্জে ওঠে সুভাষচন্দ্র বসুর কণ্ঠস্বর। গলায় রীতিমত ‘সন্ত্রাস’, ‘রাজদ্রোহ’!

কলেজের পরবর্তী অধ্যক্ষ ব্রাদার ভিয়েরা ও অধ্যাপক নলিনীকান্ত মিশ্রের বর্ণনায় জানা যায়, দর্শকাসনে আইরিশ ব্রাদার জে আই ও লিরি, অন্যান্য অধ্যাপক ও ছাত্র ছাড়াও হাজির বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ রাজপুরুষ। কিন্তু সারা হলঘরে অখণ্ড নিস্তব্ধতা। দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ। এত বড় কথার পরেও তাঁর উপরে নেমে এল না রাজরোষ!

চিত্র ২:

নেতাজির সামনে হাজির হয়ে ছোট্ট মেয়েটা তাঁর হাতে গুঁজে দিল মুগা কাপড়ে তৈরি একটা থলি। নেতাজি উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন, ‘এতে কী আছে!’

মেয়েটা বলল, ‘এতে পঁচাত্তর টাকা আছে। আমি চাঁদা তুলেছি।’

বাবা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মী। তাই নেতাজির কাছে ঘেঁষলে কর্তাদের রোষানলে পড়ায় আশঙ্কা থাকে। কিন্তু নাছোড়বান্দা মেয়ে কল্পনা বরুয়া জেদ ধরেছে, ‘নেতাজিকে দেখবই।’ শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হয় বাবাকে। আনন্দে নিজের তৈরি মুগা সিল্কের থলিতে মেয়ে চাঁদা তুলতে শুরু করে। মোঁপ্রেম হিন্দু মিশন প্রাঙ্গণে একটু আগে সেই ব্যাগটাই নেতাজির হাতে তুলে দিয়েছে কল্পনা।

অবাক নেতাজির প্রশ্ন, ‘এত টাকা দিয়ে আমি কী করব?’

মেয়ের ঝটপট জবাব, ‘কেন, দেশের কাজে লাগাবেন।’

সদ্যকিশোরীর স্বতঃস্ফূর্ত সেই আবেগের সামনে অভিভূত সুভাষ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেননি। পরে আদর করে কল্পনাকে কাছে টেনে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, ‘সাহসী হও। দেশকে ভালবাসতে শেখো।’

কল্পনাকে প্রশ্ন করলেন, ‘তুমি বন্দে মাতরম্ গানটা গাইতে জানো?’

কল্পনা জানে না বলায় নিজে এক লাইন গেয়ে শোনালেন এবং কল্পনাকে তাড়াতাড়ি গানটা শিখে নিতে বললেন। মন্ত্রমুগ্ধ কল্পনা তিন দিনের মধ্যে গানটা শিখে নিয়েছিল।

পরবর্তীকালে এই কল্পনা বরুয়া গুণ্ডই হয়েছিলেন সমগ্র অসমের প্রথম মহিলা সাংবাদিক। ৮৩ বছর বয়সে প্রয়াত কল্পনাদেবী দীর্ঘদিন কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন।

উপরের ছবি দু'টো শিলংয়ে নেতাজির জনপ্রিয়তার কোলাজের দু'টো টুকরোমাত্র।

১৯৩৮ সালে নেতাজির শেষ শিলং সফর জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাঁর জনপ্রিয়তা এমন তুঙ্গে নিয়ে যায় যে, আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের জন্য অনেক যুবক পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিলেন।

সিঙ্গাপুর, আন্দামান, বর্মা হয়ে নাগাল্যান্ড-মণিপুরে নেতাজি ও আজাদ হিন্দের লড়াইয়ে তখনও বাকি বছর পাঁচেক। স্বাধীনতা ও দেশভাগের বাকি নয় বছর। কিন্তু ১৯৩৮ সালে নেতাজি দেওয়াল হয়ে না দাঁড়ালে অসম স্বাধীন ভারতের মানচিত্রে থাকত কি না সন্দেহ।

১৯২৭ সালের জুনে অসুস্থ সুভাষ প্রথমবার শিলংয়ে আসেন। পৌঁছে দেন বাবা, দাদা ও বৌদি। থাকার ব্যবস্থা হয় কেলসাল লজে। ব্রিটিশের নজরবন্দি অবস্থায় সেখানে চার মাস কাটান সুভাষ। চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন শিলং শহরের প্রবীণ চিকিৎসক পুলিনবিহারী দেব। বিধানচন্দ্র রায়ও তখন শিলংয়ে তাঁর গ্রীষ্মকালীন আবাসে রয়েছেন। প্রায়ই দেখে যেতেন সুভাষকে। আষাঢ়ে ঘ্যানঘেনে বর্ষার শিলংয়ে ক্লান্ত না লাগলেও 'ডিপ্রেসিং' বোধ হচ্ছে বলে চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে চিঠিতে লিখেছেন সুভাষচন্দ্র। অসমের দুই নেতা তরুণরাম ফুকন ও নবীন বরদলৈ সরকারের 'বিশেষ অনুমতি' নিয়ে সুভাষচন্দ্রের একাকিত্ব দূর করতে আসতেন। আর বিপ্লবী যুবকের জন্য ভালমন্দ রান্না করে পাঠাতেন গোপনচারিণী সাহসী মায়েরা। যাঁদের স্বামীরা ছিলেন সরকারি কর্মী।

নেতাজির প্রথম শিলংবাসের সময়েই তৃতীয় ও শেষবারের শিলং সফরে এসেছেন রবীন্দ্রনাথও। উঠেছেন সলোমন ভিলায়। কিন্তু তাঁদের দেখা হয়নি। সম্ভবত দু'জনই তখন রাজরোষে।

পরেরবার এক টালমাটাল রাজনৈতিক পরিবেশে শিলংয়ে পা রাখেন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ। মুসলিম লীগ তখন অসমের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ শুরু করেছে। পৃষ্ঠপোষক মহম্মদ সাদউল্লাহের মনে তখন ইসলামিক রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন এবং সুবিশাল অসম রাজ্যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখিয়ে তাকে সেই ইসলামিক রাষ্ট্রের অংশ করার অভিসন্ধি।

১৯৩৭ সালে ব্রিটিশরাজ প্রাদেশিক রাজ্যগুলোকে স্বায়ত্তশাসনের আংশিক অধিকার দিয়ে গণভোটের মাধ্যমে নিজ নিজ রাজ্যে মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি দিল। শুরু হল সাদউল্লাহর কূটনৈতিক দৌরাত্ম্য। ভারতের অন্য সাত রাজ্যে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জিতলেও অসমে ১০৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পায় মাত্র ৩৮টি আসন। স্যর সাদউল্লাহ তখন মুসলিম দলগুলোকে একত্র করে গঠন করেন 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি'। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গঠন করেন অসমে সরকার। নিজে হন অসমের প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী হয়েই 'গ্রো মোর ফুড' অভিযানের নামে পূর্ববঙ্গের রংপুর, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ ইত্যাদি জায়গা থেকে অজস্র মুসলিম পরিবারকে সরকারি খরচে অসমে এনে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন সাদউল্লাহ। যাতে পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের জয়যাত্রা অক্ষুণ্ন থাকে।

কিছুদিনের মধ্যেই সাদউল্লাহ সরকারের বিরুদ্ধে চার দফা অনাস্থা প্রস্তাব আনে কংগ্রেস। সাদউল্লাহ তার যুক্তিগ্রাহ্য জবাব না দিয়ে হঠাৎই গভর্নরের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী গভর্নর বিরোধী পক্ষের কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বরদলৈকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। ১৯৩৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের তারিখও নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আচমকা বেঁকে বসেন সাদউল্লাহ। বলেন, পরিষদের মনোনীত ইউরোপীয় বিধায়কদের সাহায্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করবেন। সঙ্কটকালে দিল্লি থেকে অসমে এলেন কংগ্রেস সাংসদ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। কিন্তু তিনিও কংগ্রেসের দলীয় সংখ্যালঘুতা বিচার করে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনে অনুমতি দিলেন না। গভর্নর সে কথা মেনে নিতে আরও উৎফুল্ল হলেন সাদউল্লাহ।

চূড়ান্ত অসহায় অবস্থায় 'পরিত্রাতা' হিসেবে সুভাষকে ফোন করলেন গোপীনাথ বরদলৈ ও বিষ্ণুরাম মেধি। জরুরি কল পেয়েই সেপ্টেম্বরে আসানসোল থেকে শিলং পৌঁছলেন সুভাষ। উঠলেন অ্যাশলে হল-এ। সব শুনে ডেকে পাঠালেন কংগ্রেসের সব বিধায়ক ও অন্যান্য দলের নেতাদের। বিশেষ জোর দিলেন উপজাতি নেতাদের উপরে। তাঁর ডাক পেয়ে কাছাড়, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট, ধুবুড়ি, গৌরীপুর, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া পাহাড়ের উপজাতীয় নেতারা সকলে হাজির।

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা এবং যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় সুভাষ সকলের মন জিতে নিলেন। বোঝালেন, অসমে কোনওভাবেই মুসলিম লীগের সরকার গড়তে দেওয়া চলবে না। তা হলে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে বাকি সম্প্রদায় ও অসম। বোঝালেন, ধর্মের ভিত্তিতে ক্ষমতা দখল, বিভাজন বা রাজ্য শাসন মোটেই এখানকার সংস্কৃতি বা আদর্শ হতে পারে না। জাতীয় কংগ্রেসের নীতি হল সকলের সমানাধিকার, সেই নীতি মেনেই অসমের মন্ত্রিসভা গঠিত হোক। এই বিভাজন নীতির পিছনে যে ইংরেজদের প্রচ্ছন্ন মদত রয়েছে, তাও সকলকে বোঝাতে সক্ষম হলেন নেতাজি।

এরপর সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে তিনি ঘোষণা করেন, অসমের গভর্নর মন্ত্রিসভা গঠন স্থগিত রেখে বেআইনি কাজ করছেন। সরকারপক্ষ পদত্যাগ করলে বিরোধীকে সরকার গড়তে ডাকাই দস্তুর। কিন্তু এখানে মুসলিম লীগকে ফের সরকার গড়ার সুযোগ দিলে ফল হবে অত্যন্ত মারাত্মক।

অসমের রাজনৈতিক সঙ্কটের সংবাদ সংগ্রহে কলকাতা থেকে যাওয়া অসমিয়া সাংবাদিক সতীশচন্দ্র কাকতির প্রশ্নের জবাবে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ সেদিন বলেছিলেন, 'কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা গঠন করতেই হবে অসমে। না হলে অসম শেষ হয়ে যাবে।' অসমের জন্য নেতাজির এমন আন্তরিক উৎকণ্ঠা ও দূরদর্শিতা দেখে মুগ্ধ সতীশচন্দ্র তাঁকে এক 'কিংবদন্তি দেশপ্রেমী' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনের পরই সুভাষ শিলং থেকে দিল্লিতে ভাইসরয়কে ফোন করেন। বলেন, গভর্নরের পক্ষপাতিত্বের জন্য অসমে এখন সরকার ছাড়াই শাসন চলছে। আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অসমে কংগ্রেসের শপথ গ্রহণ যদি ১৮ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত দিনে না হয়, তবে জাতীয় কংগ্রেস এই অসাংবিধানিক প্রক্রিয়া মেনে নেবে না এবং প্রয়োজনে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের কংগ্রেস মন্ত্রিসভাও এর প্রতিবাদে পদত্যাগ করবে।

সুভাষের তেজ ও জেদের সামনে মাথা নোয়াতে হয় গভর্নরকে। ভাইসরয়ের নির্দেশে পরদিনই উঠে যায় গভর্নরের স্থগিতাদেশ। কংগ্রেসকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানালেন গভর্নর। গোপীনাথ বরদলৈ-এর নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা শপথ নিল। মুসলিম লীগেরও অনেক সদস্য সুভাষের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে ফের কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতা দিয়ে ১৯৩৮ সালে যে আশঙ্কা করেছিলেন, সেটাই ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় অসমের নেতারা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন। সেদিন সুভাষচন্দ্র ভাইসরয়কে ফোন করে চাপ সৃষ্টি না করলে আজকের অসমের স্থান হয়তো হত অন্য দেশের মানচিত্রে।

মহান দেশনেতাকে শিলংয়ের বেশ কিছু স্থানে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল। সেন্ট এডমন্ড'স কলেজে আইরিশ ব্রাদারের আমন্ত্রণে আসা সেই সভায় সুভাষচন্দ্র আরও বলেছিলেন, 'আমায় ব্রিটিশ সরকার জেলে পুরে রাখতেই ভালবাসে। বলে আমি নাকি টেররিস্ট। হ্যাঁ, আমি দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। সে অধিকারে আমরা কেন বঞ্চিত থাকব? ইংরেজের বিরুদ্ধে আমার কোনও বিদ্বেষ নেই। তাঁরা আমাদের দেশে থাকতে পারেন। তবে শাসক হিসেবে নয়, ভারতবাসী হিসেবে।'

সেই সভায় নেতাজির গলায় সেদিন পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল শিলংয়ের নিজস্ব ফুল আকাশিরঙা 'ফরগেট মি নট'-এর সুবিশাল এক মালা। যে মালায় জড়িয়ে ছিল শিলংবাসীর ভালবাসা, আর তাঁর মত এক অনন্য ব্যক্তিত্বকে কখনও না ভোলার বার্তা।

• সংগৃহীত

শ্রদ্ধাঞ্জলি/২

১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে ইন্ডিয়া গেটে বসছে নেতাজির গ্রানাইট মূর্তি

দেশনায়কের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনকে স্মরণীয় করে রাখতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ বছর দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা বর্ষে বছরভর পালিত হচ্ছে 'আজাদি কি অমৃত মহোৎসব'। জোড়া উদ্‌যাপন শুরু হয়েছে ২৩ জানুয়ারি ২০২২ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন থেকেই। তার ঠিক দু'দিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে নেতাজির সুদীর্ঘ গ্রানাইটের মূর্তি স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন। যতদিন তা তৈরি না হয়, ততদিন পর্যন্ত থাকবে একটি 'হলোগ্রাম স্ট্যাচু'।

২১ জানুয়ারি ২০২২ টুইট করে নিজেই এই বিশেষ উদ্যোগের কথা জানান প্রধানমন্ত্রী মোদী। ১২৫তম বর্ষে নেতাজির এই মূর্তি স্থাপন তাঁর প্রতি দেশবাসীর অফুরান ঋণ স্বীকারের প্রতীক হয়ে থাকবে, এমনই আশা তাঁর। ২৩ জানুয়ারি, নেতাজির জন্মদিনেই মূর্তি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। আপাতত 'হলোগ্রাম স্ট্যাচু'র উদ্বোধন করা হয়েছে। কারণ, গ্রানাইটের মূর্তিটি সম্পূর্ণভাবে তৈরির আগে পর্যন্ত এই হলোগ্রাম স্ট্যাচুটাই থাকবে ইন্ডিয়া গেটে। কেন্দ্রের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে সবমহল।

এদিকে, ২১ জপনুয়ারি ২০২২ দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের কাছে অবস্থিত 'অমর জওয়ান জ্যোতি'কে 'জাতীয় যুদ্ধ স্মারক'-এ যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

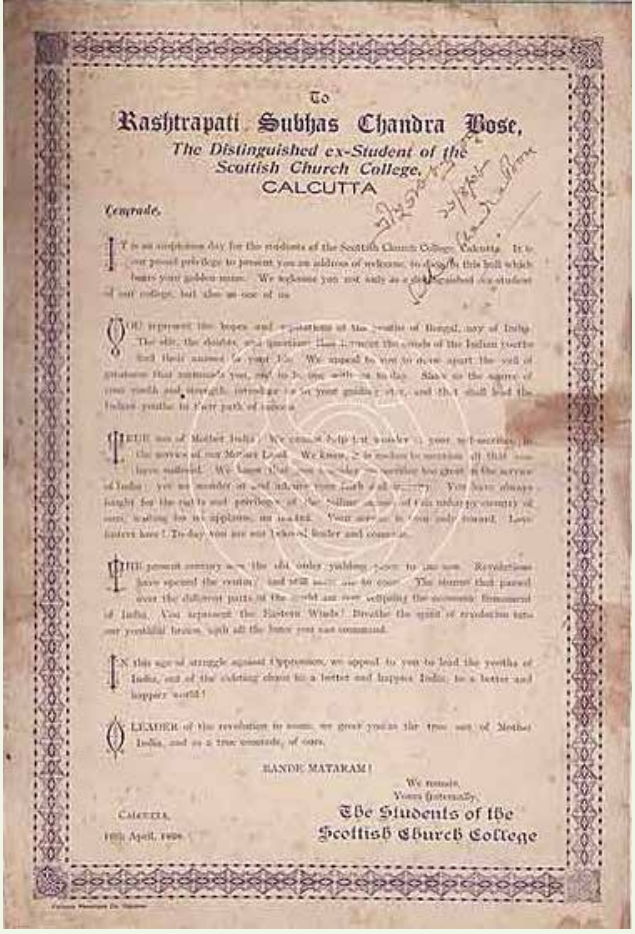

To

Rashtrapati Subhas Chandra Bose,

The Distinguished ex-Student of the Scottish Church College, CALCUTTA

Comrade,

BANDE MATARAM!

We remain,
Yours fraternally,

The Students of the Scottish Church College

Calcutta,

ছবি সৌজন্য: স্কটিশ চার্চ কলেজ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সুভাষ-জীবনের নানা অধ্যায় নিয়ে অনলাইন প্রদর্শনী

'বিখ্যাত' প্রাক্তনীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর সূচনা উপলক্ষে অনলাইন প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে স্কটিশ চার্চ কলেজ। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্ব সুভাষচন্দ্রের স্বাক্ষরিত মানপত্র। হলদে হয়ে যাওয়া পাতায় বাংলা ও ইংরেজিতে স্বাক্ষর। স্বাক্ষরকারীর নাম সুভাষচন্দ্র বসু! ১৯৩৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পরে স্কটিশ চার্চ কলেজে সংবর্ধনা সভায় এসে মানপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন তিনি।

সইয়ের নীচে জ্বলজ্বল করছে সে দিনের তারিখটিও। 'বিখ্যাত' প্রাক্তনীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর সূচনা উপলক্ষে অনলাইন প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে স্কটিশ চার্চ কলেজ। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্বের সেই নথিই এবার উঠে এসেছে ওই প্রদর্শনীতে। প্রসঙ্গত, সে-সময়ের রীতি মেনে সুভাষচন্দ্রকে 'রাষ্ট্রপতি' হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। নথিটি কলেজকে দিয়েছিলেন আর এক প্রাক্তনী ভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষা অর্পিতা মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি অনলাইন ওই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সুভাষচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে জুড়ে থাকা নানা পর্বের নথিই উঠে এসেছে সেখানে। যেমন, একেবারে নবীন কলেজপড়ুয়া সুভাষের সাদা-কালো আলোকচিত্র। মাথা ভর্তি চুল, উজ্জ্বল চোখ আর নাকের তলায় সরু গোঁফের সেই চেহারার সঙ্গে আমজনতার মনে গেঁথে থাকা 'নেতাজি'র ছবি অনেকটাই আলাদা। রয়েছে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোরের স্বেচ্ছাসেবক সুভাষের ছবিও।

সুভাষচন্দ্রের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর সূচনা উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবার অনেক জায়গাতেই রাজনীতির 'কালি' লেগেছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুষ্ঠান নিয়ে কোনও কোনও মহল থেকে বিতর্ক উঠেছে, এমনকি, ভিক্টোরিয়ার প্রদর্শনী ঘিরেও তৈরি হয় 'নথি-বিতর্ক'। অনেকেরই মতে, স্কটিশ চার্চের প্রদর্শনী অনেক বেশি তথ্যনিষ্ঠ এবং ঐতিহাসিক গুণে সমৃদ্ধ। প্রাথমিকভাবে কলেজের ওয়েবসাইট ও ইউটিউবে প্রদর্শনীটি দেখা যাচ্ছে। মূলত স্থিরচিত্রের সঙ্গে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিয়ে ওই প্রদর্শনী সাজানো হয়েছে।

কলেজ সূত্রের খবর, কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেই সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে প্রদর্শনী করার পরিকল্পনা করেছিলেন অধ্যক্ষা অর্পিতাদেবী। সহ-অধ্যক্ষ সুপ্রতিম দাস এবং ইতিহাস বিভাগের শিক্ষিকা শ্রীময়ী গুহঠাকুরতা যুগ্মভাবে প্রদর্শনীটির 'চিত্রনাট্য' রচনা করেছেন। সুরারোপ করেন উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের শিক্ষিকা মধুমঞ্জরী মণ্ডল। সুপ্রতিমবাবু বলেন, 'এই নথিগুলো কলেজের নিজস্ব সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার থেকে নেয়া হয়েছে। এই নথি সংক্রান্ত গবেষণায় গ্রন্থাগারিক মানসী গুহের অবদান অনস্বীকার্য।' তিনি জানান, তড়িঘড়ি করে প্রদর্শনীটির আয়োজন করা হয়েছে। তবে ইতিমধ্যেই নেট দুনিয়ায় প্রশংসিত হয়েছে তাঁদের উদ্যোগ। অনেকেই ই-মেইলে কলেজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে কোনও বাচিক শিল্পীকে দিয়ে কণ্ঠস্বর আরোপ করিয়ে প্রদর্শনীটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার পরিকল্পনাও আছে বলে জানান তিনি। • সংগৃহীত

ব্রিটিশ আধিকারিকরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন লাইসেন্সবিহীন আগ্নেয়াস্ত্র পেয়ে, যেগুলো প্রাক্তন আইএনএ সদস্যরা ব্যবহার করতে পারতেন

স্মরণাঞ্জলি/২

প্রতিবাদী রাজনীতির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিল নেতাজির আইএনএ

সুরঞ্জন দাস

রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছিল তাঁদের মধ্যে। তা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধী নেতাজিকে সম্বোধন করতেন 'দেশপ্রেমিকদের দেশপ্রেমিক' বলে। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে নেতাজির অনমনীয় সংগ্রাম, এক ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক এবং স্বাধীন ভারতের লক্ষ্যে তাঁর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আইএনএ) গঠনের কাহিনি অনেক শোনা। কিন্তু পাশাপাশি এও ফিরে ভাবা প্রয়োজন, কীভাবে আইএনএ ১৯৪৫-৪৬ সালের ভারতের ভিতর এক প্রতিবাদী রাজনীতির জন্ম দিয়েছিল, যা উপমহাদেশের ক্ষমতা হস্তান্তরকে ত্বরান্বিত করে। অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, ভারতীয় রাজনীতির এই অধ্যায়টি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা হয়নি। আমরা সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর সূচনালগ্নকে ব্যবহার করতে পারি এক 'আর্কাইভাল ডেটাবেস' তৈরির জন্য, যাতে এই কম গবেষণা হওয়া দিকটি নিয়ে চর্চা করা যায়।

নিকোলাস মনসারেগ ও পেন্ডেরাল মুন সম্পাদিত ক্ষমতা-হস্তান্তর সম্পর্কিত নথিপত্র, সুগত বসু, গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা ও গিরিশচন্দ্র মাইতির বই থেকে আইএনএ-র সমসময়ে ভারতীয় পরিস্থিতি বিষয়ে যা আমরা জানতে পারি, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৫ সালের অগস্ট মাস। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার অপরাধে আজাদ হিন্দ সৈন্যদের বন্দি করে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর সিদ্ধান্ত নিল ব্রিটিশ সরকার। সঙ্গে সঙ্গেই দেশ জুড়ে তুমুল বিক্ষোভ শুরু। ঘটনাচক্রে যে তিন আইএনএ অফিসার– শাহ নওয়াজ, গুরবক্স সিংহ ধিলোঁ ও পি কে সায়গলের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়, তাঁরা ছিলেন যথাক্রমে মুসলিম, শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। এক ভয়ঙ্কর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে কলকাতায়, ১৯৪৫-এর ২১ থেকে ২৩ নভেম্বর। ২১ নভেম্বর বার হয় এক ছাত্রমিছিল, যাঁদের হাতে ধরা ছিল কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট দলের পতাকা আর সুভাষের ছবি– সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্যের এক বৃহত্তর প্রতীক। ডালহৌসি স্কোয়্যারে মিছিল প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। মারা যান এক হিন্দু ও এক মুসলিম ছাত্র। পরের দু'দিন কলকাতার জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। পুলিশের গুলিতে মারা যান ৩৩ জন, আহত হন ২০০ প্রতিবাদী। বাংলার গভর্নর ক্যাসি লেখেন, 'গুলি চালানোর সময়ও তাঁরা জায়গা থেকে নড়েননি বা বড়জোর কয়েক পা পিছিয়ে, ফের আক্রমণের মুখে ফেরত এসেছিলেন।'

পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, বম্বে, মাদ্রাজ, মেরঠ, কানপুর ও গ্বালিয়র, হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর ও কাশ্মীর আজাদ হিন্দের বিষয়ে ঐকমত্য দেখিয়েছিল। পঞ্জাবের গভর্নর গ্ল্যান্সি বলেন যে, ভারতীয় সৈন্যরা ইউনিফর্ম পরেই আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থনে মিটিং-মিছিলে যোগ দিচ্ছে। ব্রিটিশ আধিকারিকরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন লাইসেন্সবিহীন আগ্নেয়াস্ত্র পেয়ে, যেগুলো প্রাক্তন আইএনএ সদস্যরা ব্যবহার করতে পারতেন। আগরা এবং বারাণসীতে পোস্টার লাগিয়ে হুমকি দেওয়া হয়, কোনও আইএনএ বন্দিকে হত্যা করা হলেই ইউরোপীয়দের হত্যা করে তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। সুভাষের নাম তখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে, 'জয় হিন্দ' উত্তর-পূর্বের জনজাতিদের মধ্যে, বিশেষত নাগা, মিজো, কুকিদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়। অসমে আইএনএ-র অনুকরণে এক জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে ওঠে।

গণদাবির মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার তিন আইএনএ অফিসারকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তা সত্ত্বেও, যখন আইএনএ ক্যাপ্টেন আজাদ হিন্দ ফৌজের আব্দুল রশিদের সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়, কলকাতা ফের উত্তাল হয়ে ওঠে। সময়টা ১৯৪৬ সালের ১১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী, পুলিশের গুলিতে ৮৪ জন নাগরিকের মৃত্যু হয়। বেসরকারি মতে অবশ্য সংখ্যাটা ছিল ২০০। ঢাকা, অমৃতসর, দিল্লি, আগ্রা, লখনউ, পটনা, নাগপুর, পুণে-তে রশিদের শাস্তির বিরুদ্ধে হরতাল চলে। বম্বে, করাচি, লাহৌর, কানপুর আর কটকের শ্রমিক শ্রেণি কাজ বন্ধ করে দেন তাঁদের কাজের পরিবেশের উন্নতি আর ব্রিটিশ রাজের অবসানের দাবিতে। এই বিক্ষোভগুলোর মধ্যে এক অভূতপূর্ব শ্রেণিচেতনা এবং জাতীয়তাবাদী আবেগের বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছিল।

আইএনএ-র বিচারপর্ব ব্রিটিশ মিলিটারিতে ভারতীয়দের মধ্যে বিক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বম্বের তলওয়ার 'ট্রেনিং শিপ'-এর নিম্ন আধিকারিকরা আইএনএ-র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অনশন শুরু করেন নিম্নমানের খাদ্য এবং ব্রিটিশ অফিসারদের জাতিবিদ্বেষের প্রতিবাদে। বিদ্রোহীরা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অনুকরণে নিজেদের নাম দেন 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল নেভি'। বিক্ষোভ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বম্বে বন্দরের অন্যান্য জাহাজে এবং করাচি, মাদ্রাজ, কলকাতা, কোচি, বিশাখাপত্তনম ও আন্দামানের নৌঘাঁটিতে। দাবি ছিল, আইএনএ অফিসারদের মুক্তি এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহার। এর ফলে বিদ্রোহীদের সঙ্গে পুলিশ ও সেনার সংঘর্ষ বাধে। ভারতীয় সেনার বেশ কিছু ইউনিট নৌ-বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়তে অস্বীকার করে। বম্বে, মাদ্রাজ ও কলকাতার রয়্যাল এয়ারফোর্স, জব্বলপুর ও অম্বালার সেনা ছাউনি এবং বিহার পুলিশের ভারতীয় সদস্যরা নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থন জানায়। এক সেনা অফিসার বলেন যে, আইএনএ-র ঘটনাটি 'ভারতীয় বাহিনীর সম্পূর্ণ কাঠামোটাকেই ধূলিসাৎ করে দেওয়ার উপক্রম করেছিল।' ১৯৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর এক গোপন রিপোর্টে ভাইসরয় ওয়াভেল ব্রিটিশ আর্মি ও পুলিশের ভারতীয় সদস্যদের আনুগত্যহীনতার আশঙ্কা করেন, মনে করেন 'প্রথম সুযোগেই' ব্রিটিশ আধিকারিকদের এক বিশাল অংশ অবসর নিতে পারেন। নাগরিক সমাজও বিদ্রোহী বাহিনীকে সমর্থন জানিয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বম্বের শ্রমিক শ্রেণি তাঁদের যন্ত্রপাতি নামিয়ে রাখেন। শহরের বিভিন্ন জায়গায় মিছিল এবং পুলিশ ও মিলিটারির সঙ্গে সংঘর্ষে ২২৮ নাগরিকের মৃত্যু হয়। মাদ্রাজ ও করাচিতে নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে শুরু হয় হরতাল।

আইএনএ-র বিচারপর্ব যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিবাদের সূচনা করে, তার থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে অশান্ত হয়ে ওঠে গ্রামাঞ্চলের এক বিস্তৃত অংশ। বাংলায় তেভাগা আন্দোলন প্রচলিত ভাগচাষ পদ্ধতির দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উত্তর কানাড়া, মালাবার, তুলনামূলক ভাবে কম সক্রিয় এলাকা, যেমন– অজমের, সিন্ধু, বালুচিস্তান ও কুর্গে ভাড়াটিয়ারা ভাড়া হ্রাস করার দাবিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। নালগোন্দা ও ওয়ারাঙ্গলে কৃষকরা জবরদস্তি শস্য সংগ্রহের কাজে বাধা দেন। তৎকালীন ত্রিবান্দ্রামের আলেপ্পিতে দেওয়ানের অপশাসনের বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব কৃষক-শ্রমিক অভ্যুত্থান দেখা যায়।

মহাত্মা গান্ধী ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত সচিবকে সতর্ক করে জনগণের মনোভাবকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এই ভাবে যে, 'ভারতীয়দের এই সর্বব্যাপী বিরোধিতার মুখে' আইএনএ-র সৈন্যদের বিচার হলে, তা ক্ষমতার অপব্যবহার করা হবে। অক্ষশক্তির সমর্থন নিয়ে সুভাষচন্দ্রের ব্রিটিশ-ভারতকে মুক্ত করার প্রয়াসের বিরোধী ছিল যারা, সেই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পি সি জোশীও ১৯৪৫ সালের ২২ নভেম্বর উপদেশ দেন: যুদ্ধকালীন ভাবনাগুলোকে মাথা থেকে তাড়াও। যুদ্ধ-পরবর্তী বৈপ্লবিক পরিস্থিতি দ্রুত তৈরি হচ্ছে। নতুন পন্থা চাই। মানুষের সঙ্গে থাকো। সিপিআই-এর মুখপত্র স্বাধীনতা-র একাধিক সম্পাদকীয়তে জনগণকে অনুরোধ করা হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অন্তিম সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য।

আইএনএ-র অনুপ্রেরণা এবং আইএনএ বিচারপর্বের বিরোধিতা ১৯৪৫-৪৬ সালে যে বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল, তা দেখে ব্রিটিশ আধিকারিক পেন্ডেরাল মুন বর্ণনা করেছিলেন ব্রিটিশরাজ 'এক আগ্নেয়গিরির মুখে' বসে আছে। লন্ডনও এই সময় আরও সৈন্য পাঠানোর প্রস্তাবে বেঁকে বসে। অতঃপর, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্টের বিভাজনের চুক্তি, ব্রিটিশ এবং মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এক সমঝোতার মধ্য দিয়ে। হয়তো আরও বৈপ্লবিক সম্ভাবনার পথ আটকাতে। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স অফিসার হিউ টোয়ে স্বীকার করেছিলেন, আইএনএ ভারতে ব্রিটিশ যুগের সমাপ্তি দ্রুততর করেছিল। সেন্ট্রাল প্রভিন্স ও বেরার-এর গভর্নর অনুভব করেছিলেন যে, গান্ধীকে সরিয়ে সুভাষ দ্রুত জনগণের শ্রদ্ধার জায়গাটি দখল করে নিচ্ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সুভাষের 'দীপ্তি'র কিছুটা তাঁর ভাই শরতের মধ্যেও গড়ে উঠছিল।

'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' স্লোগানটি ভুল বার্তাবহ। কিন্তু ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট যা ঘটেছিল, তা আন্তোনিয়ো গ্রামশি-র কথা ধার করে বলতে হয়, 'এক পরোক্ষ বিপ্লব', যেহেতু রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে কোনও মৌলিক পরিবর্তন আসেনি। আইএনএ বিচারের প্রতিক্রিয়া ও আইএনএ-র কীর্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে সারা দেশে যে অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তা এমন আবহ সৃষ্টি করে, যাকে গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'প্রায় বিপ্লব'।

কিন্তু এই বৈপ্লবিক বিকল্পের সম্ভাবনাগুলো কেন অসম্পূর্ণ রয়ে গেল, প্রশ্নটি থেকেই যায়। প্রশ্ন রয়ে যায়, কেন শেষ মুহূর্ত অবধি দেশভাগ-বিরোধী আবেগ টিকে থাকলেও, স্বাধীনতার বিভিন্ন স্বরের উপস্থিতি, এবং শরৎ বসুর নেতৃত্বে গ্রেটার বেঙ্গল মুভমেন্ট-এর মত চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা ও ভারত ভাগ হল। ওই সঙ্কটময় দিনগুলোতে নেতাজি উপস্থিত থাকলে কি অন্য রকম হত? যা ঘটেনি, ইতিহাসবিদদের সেই চর্চায় প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু সুগত বসু যেমনটি বলেছেন: নেতাজি সংখ্যালঘুদের প্রতি উদার হতেন, ধর্মীয় সম্প্রদায় ও বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে যথাযথ ক্ষমতার বিন্যাস গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে কাজ করতেন। দুর্ভাগ্য, ভারতে তেমনটি ঘটেনি।

সুরঞ্জন দাস উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বিশেষ রচনা

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে...

আমাদের সবার জীবনেই মা, বোন, কন্যার প্রভাব রয়েছে। পৃথিবীতে তাঁরা শুধুমাত্র নতুন প্রাণের জন্মই দেন না, সেই সন্তানকে লালন-পালন করেন, তাঁকে সমাজের উপযুক্ত করে তোলেন। মহিলাদের শিক্ষা এবং তাঁদের দক্ষতা শুধুমাত্র পরিবারে নয়, সমাজ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণও করে। কেন্দ্রীয় সরকার এই মানবসম্পদ উন্নয়নে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২১ ডিসেম্বর প্রয়াগরোজ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর অ্যাকাউন্টে ১০০০ কোটি টাকা অর্থ পাঠানোর সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, 'আমরা শিশুকন্যার জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি স্তরে মহিলাদের ক্ষমতায়নের পরিকল্পনা ও প্রচারণার ব্যবস্থা করেছি।' ১০০০ পুরুষের মধ্যে ৯৯১ জন নারী। লিঙ্গ অনুপাতে শহরের তুলনায় গ্রামগুলোর ফল ভাল। শহরে, যেখানে প্রতি ১০০০ পুরুষে ৯৮৫ জন মহিলা, গ্রামে এই সংখ্যা ১০০০ জন পুরুষ পিছু ১০৩৭ জন মহিলা। শুধু তাই নয় ২০১৫-২০১৬ সালে জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাত ৯১৯ ছিল, এখন মেয়েদের সংখ্যা ৯২৯ হয়েছে। ২১ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরোজ আয়োজিত নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে এই সাফল্যের বিষয়টি উপস্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'গর্ভস্থ শিশুকন্যাদের হত্যা করা ঘৃণ্য অপরাধ। প্রতিটি শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার অধিকার রয়েছে। সেই লক্ষ্যে আমরা 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' অভিযান শুরু করেছি। সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের অনেক রাজ্যে কন্যাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কন্যারা যাতে পড়াশোনা সম্পন্ন করতে পারে এবং তাঁরা যাতে স্কুলছুট না হয়, সেজন্য আমরা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার আওতায় প্রায় আড়াই কোটি মেয়ের অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। বড় হওয়ার পর তাঁদের স্বপ্ন পূরণের জন্য এই অর্থে সুদের হারও বেশি ধার্য করা হয়েছে।'

২০১৪ সালে মা ভারতীর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকার শিশুকন্যাদের শিক্ষা ও জীবন রক্ষার মত বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' এখন আর নিছক সরকারি অভিযান নয়, সারা দেশে এই স্লোগান ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের চিন্তাধারা ক্রমশ পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। মাতৃ জঠরে যাঁদের হত্যা করার রেওয়াজ ছিল, এখন সেই সকল শিশুকন্যারা পৃথিবীর আলো দেখতে পাচ্ছে। ফলস্বরূপ স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবার পুরুষের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের কন্যারা আজ নিজেদের স্ব-আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে যা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সকলের সঙ্গে, সকলের বিকাশ, সকলের বিশ্বাস ও সকলের প্রয়াস' মন্ত্রের কারণে। এখন দেশের কন্যারা শিক্ষায়-প্রতিভায় নিজের ভাগ্য জয় করে নিতে সক্ষম। •

• মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে যাতে প্রসবের পরে মহিলারা নিজেদের এবং সন্তানের প্রাথমিক যত্ন নিতে পারেন। এতে কর্মক্ষেত্রে সংক্রান্ত উদ্বেগ হ্রাস পায়। দরিদ্র পরিবারগুলোতে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা বেশ কঠিন। তাই অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের টিকাকরণ, হাসপাতালে প্রসব এবং গর্ভাবস্থায় পুষ্টির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি।

• প্রধানমন্ত্রী মাতৃত্ব বন্দনা যোজনার অধীনে, অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৫০০০ টাকা জমা দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন। এখনও পর্যন্ত দুই কোটিরও বেশি গর্ভবতী মহিলাকে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

• স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে কর্মজীবন এবং সংসার পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে নারীদের সুবিধা ও স্বাস্থ্যের জন্য সর্বোচ্চ যত্ন নেওয়া হচ্ছে। স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে কোটি কোটি শৌচাগার নির্মাণ, উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে দরিদ্রদের গৃহে গ্যাস সংযোগ সুবিধা এবং বাড়ি বাড়ি কলের জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে আমাদের বোনদের জীবনে নিত্যদিনের কাজগুলো সহজ হয়ে উঠেছে এবং তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

• আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে, এই প্রকল্প থেকে মহিলারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন।

• প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে যে বাড়িগুলো হস্তান্তর করা হচ্ছে, সেগুলো মহিলাদের নামে করা হয়েছে। মুদ্রা যোজনা গ্রামের দরিদ্র পরিবারের নতুন মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করছে। এই প্রকল্পের অধীনে অনুমোদিত মোট ঋণের প্রায় ৭০% মহিলাদের দেওয়া হয়েছে।

• দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনার মাধ্যমে সারা দেশে স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং গ্রামীণ সংস্থাগুলোর সঙ্গেও মহিলাদের যুক্ত করা হচ্ছে। ২০১৪ সালের আগের পাঁচ বছরের তুলনায় গত সাত বছরে জাতীয় জীবিকা মিশনের অধীনে সহায়তার পরিমাণ প্রায় ১৩গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে আগে প্রতিটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী গ্যারান্টি ছাড়াই ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতেন, এখন সেই সীমা দ্বিগুণ হয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

• করোনা মহামারি চলাকালীন সময়ে সরকার সকল নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে রেশন নিশ্চিত করেছে। মহিলারা যাতে রাতের শিফটে কাজ করতে পারেন সেই জন্য একাধিক নিয়ম সহজ করা হয়েছে। মহিলাদের খনিতে কাজ করার ক্ষেত্রেও সরকার বিধিনিষেধে ছাড় দিয়েছে।

• এখন থেকে মেয়েরাও সৈনিক স্কুলে পড়ার সুযোগ পাবে। ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধের দ্রুত বিচারের জন্য সারা দেশে প্রায় ৭০০টি ফাস্ট-ট্রাক আদালত গঠন করা হয়েছে। মুসলিম মহিলাদের সহায়তায় তিন তালাকের মত কুপ্রথার অবসানে আইনও তৈরি করা হয়েছে।

• লোকসভায় বাল্যবিবাহ নিষেধাজ্ঞা (সংশোধনী) বিল, ২০২১-এর সুপারিশ করা হয়েছে, যেখানে মহিলাদের বিবাহের বয়স ১৮ থেকে ২১ বছর করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিলটি স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। সূত্র: নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

ভ্রমণ

বিশ্ব পর্যটনক্ষেত্রে ভারত হয়ে উঠছে বিবিধের মাঝে মহামিলন তীর্থ

বর্তমান বিশ্বে দ্রুত বর্ধনশীল ব্যবসায়িক ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান হল পর্যটন। ভারতের প্রাচীন অত্যাশ্চর্য সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলো দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বের সকল দেশের মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। এখন সেই স্থানগুলোকে আধুনিক অবকাঠামোর একটি বিশাল নেটওয়ার্ক যথা রেল, সড়ক, আকাশপথ, জলপথ, হোটেল ও হাসপাতাল এবং শক্তিশালী ইন্টারনেট-মোবাইল সংযোগের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। পর্যটনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে এর লাভের গতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও, সরকারের পরিচ্ছন্নতা অভিযান পর্যটন ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে। এই দিকগুলো আন্তঃসংযুক্ত যা শুধুমাত্র পর্যটনকে উৎসাহিত করে না বরং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করে। ভারতে ২৫ জানুয়ারি জাতীয় পর্যটন দিবস পালিত হয়। ভারত বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রের পরিবর্তন সাধন করতে চলেছে।

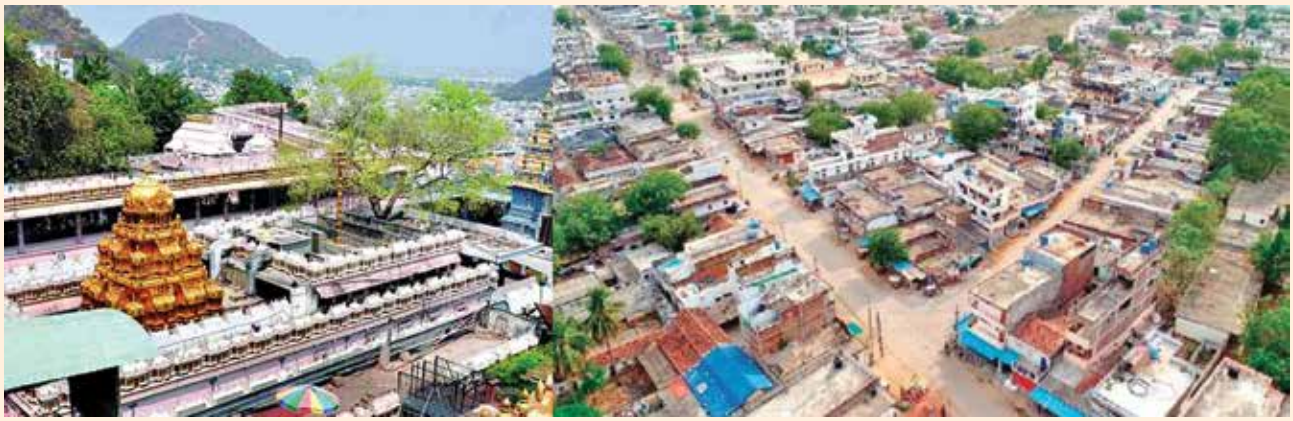

পর্যটন দেয় অভিজ্ঞতা আর অভিজ্ঞতা দেয় তৃপ্তি। ভারতের পর্যটন শিল্পের সঙ্গে আধুনিকতা পরিকাঠামো যুক্ত হয়েছে, ফলস্বরূপ মানুষের যাত্রা তথা ভ্রমণ সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, সময় অপচয় হ্রাস পেয়েছে। উপরোল্লেখিত তিনটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, সরকার যদি পর্যটনকে পুনরুজ্জীবিত করতে চায়, তাহলে উন্নত সুযোগ-সুবিধা, পরিবেশ রক্ষা, দ্রুত সংযোগের মত বিষয়গুলোর উপর মনোনিবেশ করতে হবে। আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি হলে সারা বিশ্বের মানুষের পছন্দের পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠবে ভারত। কোভিড-১৯ মহামারি বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে কোনও না কোনওভাবে প্রভাবিত করেছে। এতদিনের অভ্যস্ত জীবনধারায় পরিবর্তন এসেছে। যাইহোক, 'নতুন স্বাভাবিক'-এর এই যুগে, টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের দ্রুত গতি নতুন দিকনির্দেশনা দিচ্ছে এবং পর্যটন থেকে অর্থনীতি পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে। এর ফলস্বরূপ, আধুনিক পরিকাঠামো এবং সামগ্রিক চিন্তাভাবনা ভারতের পর্যটন ক্ষেত্রে জোয়ার এনেছে। বিশ্বের ১৬০টিরও বেশি দেশের নাগরিকদের জন্য ই-ভিসা চালু করার মাধ্যমে ভারতের পর্যটন ক্ষেত্র এক নতুন দিশা পেয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার মতে, ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বিশ্ব পর্যটন তালিকায় ভারতের স্থান ৬২ থেকে ৬৫-র মধ্যে ওঠানামা করেছিল, কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ভারত এখন সেই তালিকায় ৩৪ নম্বর স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতি পর্যটনের দিক থেকে বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে এবং স্বাস্থ্য পর্যটনের ক্ষেত্রেও বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ হয়ে উঠেছে। কেভাদিয়া পর্যটন উন্নয়নের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক, যা পর্যটন খাতে নতুন অধ্যায় রচনা করেছে।

বিশ্বাস-আধ্যাত্মিক-অধ্যয়ন পর্যটন বা স্বাস্থ্য পর্যটন, সাংস্কৃতিক পর্যটন বা ঐতিহ্য পর্যটন বা ইকো-ট্যুরিজম, যুব পর্যটন বা ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সম্পর্কিত পর্যটন, যাই হোক না কেন ভারত এখন বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হয়ে উঠছে। টিকাকরণ ও মহামারির বিরুদ্ধে ভারতের অভূতপূর্ব পদক্ষেপের কারণে কোভিডের সময় পর্যটকশূন্য ভ্রমণ স্থানগুলো এখন আবার পর্যটকদের কোলাহলে ভরে উঠছে। বিশ্বব্যাপী মহামারীর পরে এই খাত দ্রুত পুনরুদ্ধার করছে, কারণ সরকার কোভিডের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক-সামাজিক খাতের পাশাপাশি পর্যটন ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

গত বছরের জুন মাসে, সরকার ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত পাঁচ লক্ষ বিদেশি পর্যটকদের বিনামূল্যে ভিসা এবং পর্যটন মন্ত্রকের কাছ থেকে ১০০% সরকারি গ্যারান্টি-সহ ভ্রমণ ও পর্যটন সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারদের ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। নিবন্ধিত ট্যুরিস্ট গাইডদের জন্য এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণও দেওয়া হয়েছে। তবে কোভিডের নতুন ভ্যারিয়েন্টের জন্য সরকার 'ফ্রি ভিসা'র মেয়াদ বাড়ানোর কথা ভাবছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের পর্যটন খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে ভারত সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হল ই-ভিসা, যোগাযোগ, উড়ানের মত স্কিম, প্রশস্ত সড়ক নেটওয়ার্ক, পর্যটনস্থলে আধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণ এবং বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাবমূর্তি। তিনি পর্যটকদের কাছে দেশের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর। এটি তাঁর ভাবমূর্তি এবং পর্যটনের প্রচারের উদ্যোগের ফল যে কর্পোরেট বিশ্ব শুধুমাত্র তাঁর ২০১৭ সালের হেরিটেজ সাইটগুলোকে গ্রহণ করার জন্য 'অ্যাডপ্ট এ হেরিটেজ'-এর আবেদনে সাড়াই দেয়নি, বরং ২৯টি হেরিটেজ সাইটের জন্য এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় সাহায্যে অনেক স্থানে শিল্প সুবিধাও গড়ে তোলা হয়েছে। বিদেশ সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী একাধিকবার ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের অনুরোধ করেছেন। পর্যটনের প্রসারের জন্য তিনি এক বছরে অন্তত পাঁচটি অ-ভারতীয় পরিবারকে ভারতে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। কোভিডের মত অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে ভারত যেভাবে নিরাপত্তা শক্তিশালী করেছে, সারা বিশ্ব তার প্রশংসা করছে। এর সুযোগ নিয়ে ভারত সরকার 'ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া'র প্রচারের জন্য ২০টিরও বেশি দূতাবাসে পর্যটন কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে। অমৃত মহোৎসবের বছরে, সরকার ৭৫টি পর্যটন গন্তব্যকে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু করেছে। দেশের মধ্যে পর্যটনের বিকাশের জন্য, প্রধানমন্ত্রী তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে পর্যটনের জন্য বছরে ১৫টি স্থান পরিদর্শন করার এবং সেগুলো সম্পর্কে লিখে সচেতনতা তৈরি করার আবেদন জানিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য তিলক, স্বামী বিবেকানন্দ এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের মত ব্যক্তিত্বরা যখন সারা ভারত ভ্রমণ করেছিলেন, সেই

- নগেন্দ্র ভারতী উড়ান স্কিমের অধীনে বিজয়ওয়াড়া থেকে কুদ্দাপাহ পর্যন্ত বিমানযাত্রা করেছিলেন। তিনি বলেন, আগে পরিবারের সঙ্গে কুদ্দাপাহ থেকে বিজয়ওয়াড়া পর্যন্ত যাত্রা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। আগে সড়কপথে ৮ থেকে ১১ ঘণ্টা সময় লাগত, কিন্তু এখন আমরা বিমানে যাতায়াত করতে পারি। 'উড়ান ফ্লাইট' চালু হওয়ার ফলে আমার এবং পরিবারের সকলের পক্ষে কনক দুর্গা মাতা ভ্রমণ অনেক সুবিধাজনক হয়েছে। এই চমৎকার উদ্যোগের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।

- গত ডিসেম্বরে স্পেনের মাদ্রিদে ইউএন ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশনের ২৪তম সাধারণ অধিবেশনে তেলঙ্গানার পোচম্পালি গ্রামটিকে ইউএন ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন সেরা পর্যটন গ্রাম হিসেবে মনোনীত করেছে। গ্রামের অনন্য বয়ন শৈলী এবং নিদর্শনগুলোর উপস্থাপনের মাধ্যমে পোচম্পালি নিজস্ব পরিচয় গড়ে তুলেছে। একটি স্বনির্ভর ভারতের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'ভোকাল ফর লোকাল' মন্ত্রের উদাহরণ হয়ে উঠেছে পোচম্পালি। এ বছর জাতীয় পর্যটন দিবস ২৫ জানুয়ারি এই গ্রামে অনুষ্ঠিত হবার কথা।

- ভারতের একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। আমাদের সংস্কৃতি হাজার হাজার বছরের পুরনো। বিশ্বকে আমাদের আর নতুন করে কিছু দেওয়ার নেই। আমাদের দেশ নিজ ইতিহাস, কৃষ্টি, সৃষ্টিতে ভরপুর। এগুলো আমাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া জিনিস, তাঁদের আশীর্বাদ। পর্যটন ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি কেউ রোধ করতে পারবে না।

ভারত দর্শন তাঁদের জীবনে-ভাবনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাঁরা নতুন দিশা-অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' স্লোগান দিয়ে ভারতের বৈচিত্র্যকে একত্রিত করেছেন। সাধারণত, ভারতে পর্যটনের মরসুম চলে অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত। এই বিষয়টি বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলে এখন পর্যটনস্থলে পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। উন্নত পরিকাঠামোর ফলে পর্যটন ক্ষেত্রের প্রসার।

উন্নত পরিকাঠামো এবং উন্নত সংযোগ ব্যবস্থার কারণে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় পর্যটন খাত। এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে প্রত্যেকের জন্য উপার্জনের উপায় রয়েছে। ন্যূনতম বিনিয়োগে পর্যটনে সর্বোচ্চ আয় সম্ভব। এই চিন্তাভাবনা নিয়ে দেশকে স্থানীয় পর্যটনের জন্য উৎসাহিত করতে একাধিক পর্যায়ে কাজ চলছে। কোনও স্থানের সঙ্গে বিমান যোগাযোগ যখন বৃদ্ধি পায়, তখন সেই অঞ্চলে পর্যটনের বিকাশ হয়। মাতা বৈষ্ণো দেবীর দর্শন হোক বা কেদারনাথ যাত্রা হোক, হেলিকপ্টার পরিষেবা সাম্প্রতিক নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্যোগও একই কাজ করতে চলেছে।

গত কয়েক বছরের প্রচেষ্টার ফল দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। পরিকাঠামোর উন্নয়নের ফলে বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণে দেশের শীর্ষ তিন রাজ্যের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ। পর্যটকদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে অযোধ্যা বিমানবন্দর ও কুশীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য উপযোগী প্রমাণিত হবে। জীবন ও জীবিকার সঙ্গে যোগাযোগের যে ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে, কোভিডের সময়ে সারা বিশ্ব তা অনুভব করেছে। সড়ক সংযোগ হোক বা রেল, বিমান যোগাযোগ বা ইন্টারনেট সংযোগ– আজ দেশের প্রধান অগ্রাধিকার হল যোগাযোগ। এমন শক্তিশালী সংযোগের প্রত্যক্ষ সুফল পাচ্ছে পর্যটন ক্ষেত্রগুলোও। ফল ও সবজি উৎপাদনকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীরা উৎপাদিত পণ্য সহজে দূরবর্তী স্থানে পৌঁছে দিতে পারছেন। গ্রামে ইন্টারনেট সুবিধা চালু হওয়ার ফলে হিমাচলের তরুণ প্রতিভারা তাঁদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে বিশ্বের সকল পর্যটকদের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। পর্যটনের প্রচারের জন্য ভারতে ৭১টি লাইটহাউস চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সকল লাইটহাউসে সামর্থ্য অনুযায়ী জাদুঘর, থিয়েটার, ক্যাফেটেরিয়া, শিশু পার্ক, পরিবেশবান্ধব কটেজ নির্মাণ করা হচ্ছে। দেশের নির্বাচিত বন্দরগুলোতে ২০২৩ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গোয়ার পর্যটন ক্ষেত্রকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য, রাজ্যের কৃষক, জেলে এবং অন্যান্য মানুষের সুবিধার জন্য উন্নত সংযোগ পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। মা পা'তে নির্মিত গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তৈরি হতে যাচ্ছে। এই বিমানবন্দরকে জাতীয় মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করতে, প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ছয় লেনের আধুনিক সংযোগকারী হাইওয়ে তৈরি করা হচ্ছে। গত কয়েক বছরে গোয়ায় জাতীয় সড়ক নির্মাণে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

২০১৪ সালে পর্যটন মন্ত্রক প্রসাদ কর্মসূচির সূচনা করে। ন্যাশনাল মিশন অন পিলগ্রিমেজ রিজুভিনেশন অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল, হেরিটেজ অগমেন্টেশন ড্রাইভ (আদ্যাক্ষর মিলিয়ে প্রসাদ) একটি কেন্দ্রীয় তহবিল সহায়তাপুষ্ট কর্মসূচি। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল, ঐতিহ্যবাহী ও পুণ্যস্থানগুলোর মানোন্নয়ন তথা সেগুলো চিহ্নিতকরণ এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা। দেশে প্রায় ৪০টি তীর্থস্থান তৈরি করা হচ্ছে, যার মধ্যে ১৫টি প্রকল্পও সম্পন্ন হয়েছে। এর অধীনে গুজরাটেও ১০০ কোটিরও বেশি মূল্যের তিনটি প্রকল্পের কাজ চলছে। সোমনাথ ও গুজরাটের অন্যান্য

২০২১ সালের ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো থেকে ওল্টার সাইমন মিলিও (৬৯) ও জন (৮০) প্রথমবার ভারতে এসেছিলেন। ২০২০ সালের মার্চে কোভিড লকডাউনের পর এই প্রথমবার তাঁরা ১৮ দিনের ট্যুরিস্ট ভিসায় ভ্রমণে এসেছিলেন। ভ্রমণকারী হিসেবে তাঁরা ভারতের পর্যটন স্থানগুলোকে নিরাপদ বলে বর্ণনা করেন। ভারতের টিকাদান কর্মসূচিকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় 'ভাল, অনেক ভাল' বলে প্রশংসাও করেন। জীবনের এই বয়সে ভ্রমণ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন, 'ভ্রমণে বয়স কোনও বাধা নয়। যতদিন আপনি ভাল আছেন, ততদিন আপনার কাছে অ্যাডভেঞ্চার করার সুযোগ আছে।' কোভিড সময়কালে পর্যটনক্ষেত্রের বিকাশের জন্য ভারত সরকার বিনামূল্যে পাঁচ লক্ষ ভিসা প্রদান করেছিল, সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ওল্টার ও জন ভারতে এসেছিলেন। ভারতের পরিবেশ ও প্রকৃতি তাঁদের এতটাই পছন্দ হয় যে, তাঁরা অন্য পর্যটকদের ভারত ভ্রমণের অনুরোধ করেন।

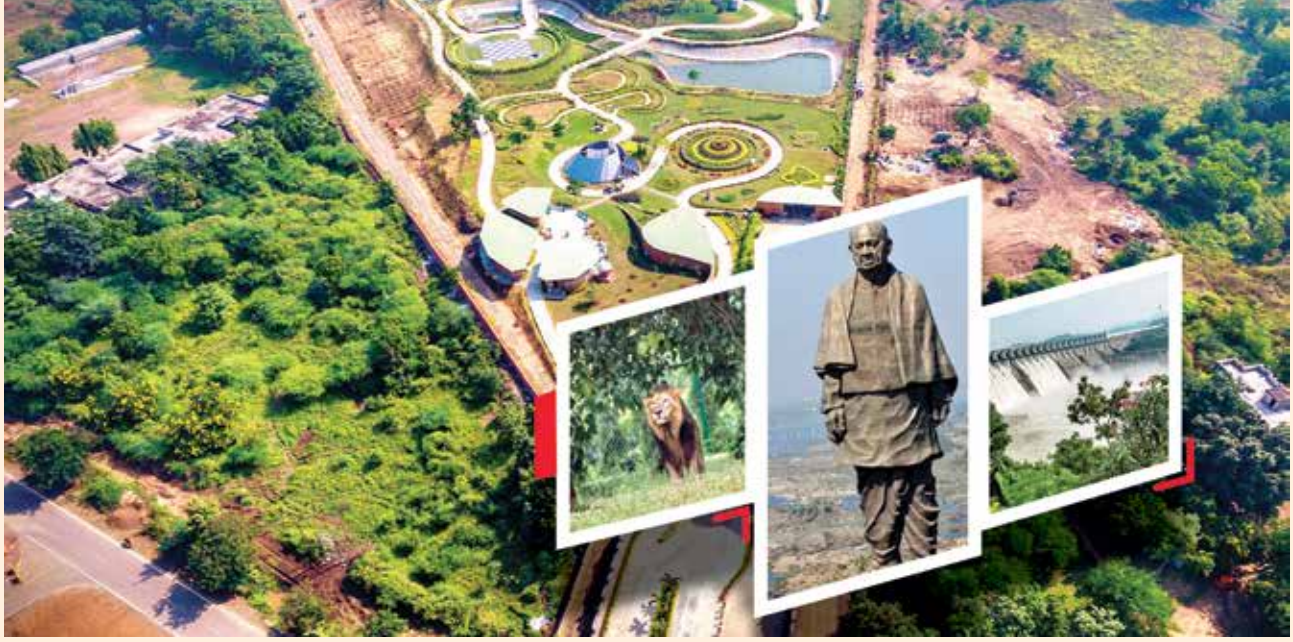

পর্যটন স্থান ও শহরগুলোর মধ্যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।

একইভাবে, সারা দেশে ১৯টি পর্যটন গন্তব্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেই স্থানগুলোর বিকাশ করা হচ্ছে। এই সমস্ত প্রকল্প আগামী সময়ে পর্যটন শিল্পে নতুন শক্তি যোগাতে প্রস্তুত। ১৫টি থিম সার্কিটের মধ্যে ৭৬টি ক্ষেত্র যুক্ত করা হয়েছে, সরকার ৯০০ টিরও বেশি পর্যটনস্থলকে যুক্ত করেছে। এর মধ্যে ৩৫টির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ১৫টি স্থানে ৮০% কাজ শেষ হয়েছে।

উন্নত পরিকাঠামো এবং উন্নত সংযোগ ব্যবস্থার কারণে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় পর্যটন খাত। এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে প্রত্যেকের জন্য উপার্জনের উপায় রয়েছে। ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে পর্যটনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আয় সম্ভব। এই চিন্তাভাবনা নিয়ে দেশকে স্থানীয় পর্যটনের জন্য উৎসাহিত করতে একাধিক পর্যায়ে কাজ চলছে।

ই-ভিসার কারণে পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি

• বিদেশি পর্যটকরা যাতে সহজে ভারত ভ্রমণে আসতে পারেন তার জন্য সরকার ৪৪টি দেশের নাগরিকদের জন্য ই-ভিসা ঘোষণা করেছিল। এখন ১৬৫টি দেশের মানুষ এই সুবিধা পান, যা ২০১৮ সালে ৪৪ ছিল। ই-ভিসা এখন দেশের ২৫টি বিমানবন্দর এবং পাঁচটি সমুদ্রবন্দরে উপলব্ধ।

• এক বছরের ই-ট্যুরিস্ট ভিসার পাশাপাশি একাধিক প্রবেশ সুবিধা-সহ পাঁচ বছরের জন্য একটি ই-ট্যুরিস্ট ভিসা চালু করা হয়েছে। উপরন্তু, দ্বৈত এন্ট্রি সহ এক মাসের ই-ট্যুরিস্ট ভিসা এবং সরকারি ও গণক্ষেত্রের কর্মচারীদের জন্য একটি ই-কনফারেন্স ভিসা চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া ভিসা খরচ মকুব করা হয়েছে।

বিশ্বতালিকায় ভারতের গতি ঊর্ধ্বগামী

পর্যটন ক্ষেত্রে সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে বিশ্ব ভ্রমণ এবং পর্যটন প্রতিযোগিতামূলক সূচকে ভারতের স্থান ক্রমাগত উপরে উঠে আসছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) প্রতিবেদন অনুসারে ১৪০টি দেশের মধ্যে ভারত ৩৪তম স্থানে রয়েছে।

৬৫ ২০১৩ ॥ ৫২ ২০১৫ ॥ ৪০ ২০১৭ ॥ ৩৪ ২০১৯

আন্তর্জাতিক পর্যটনের উন্নয়নে সরকার এই সাত বছরে অনেক নীতিগত সিদ্ধান্তও নিয়েছে, যার ফলে আজ দেশ উপকৃত হচ্ছে। 'ই-ভিসা' ও 'ভিসা অন অ্যারাইভালে'র মত বিষয়গুলো পর্যটন ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করেছে এবং ভিসা বাবদ খরচও কমানো হয়েছে। একইভাবে, পর্যটন ক্ষেত্রে আতিথেয়তার জন্য চার্জ করা জিএসটিও কমানো হয়েছে। অ্যাডভেঞ্চারের কথা মাথায় রেখে ১২০টি পর্বতশৃঙ্গও ট্রেকিংয়ের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। নতুন জায়গায় পর্যটকদের যাতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয় সেজন্য গাইডদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ভারত ভ্রমণকারী পর্যটকদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে এবং তাঁদের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলো তৈরি করে ভারত প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জিনিস করছে। পর্যটন স্থানে বিশেষ সাইনবোর্ড, বিদেশি ভাষার গাইডের সুবিধার কারণে ভারতীয় পর্যটন নতুন মাত্রা পাচ্ছে।

সাংস্কৃতিক-আধ্যাত্মিক পর্যটন: ভারতীয় ঐতিহ্যের বাহক

আজ বিশ্ব ভারতের যোগব্যায়াম, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যেও তাদের শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নতুন সচেতনতা তৈরি হয়েছে। একারণেই আজ সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পর্যটনের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে রূপ দিতে, কেবল আধুনিক পরিকাঠামোই নির্মাণ করা হচ্ছে না, বরং দেশের প্রাচীন গৌরব, ঐতিহ্যকেও পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে। রামায়ণ সার্কিটের চারপাশে ভ্রমণ একজনকে ভগবান রামের মহিমার অনুভূতি অনুধাবন করতে সাহায্য করে, সারা বিশ্ব থেকে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা বুদ্ধ সার্কিট ভ্রমণ করতে আসেন সেই মহিমা উপলব্ধি করতে। অযোধ্যার উন্নয়নের মাধ্যমে একটি আধ্যাত্মিক বৈশ্বিক পর্যটন কেন্দ্র এবং স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে, পর্যটনের প্রসারের লক্ষ্যে দেশজুড়ে ইতিহাস, বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতা, সংস্কৃতি সম্পর্কিত সমস্ত স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ পর্যটন ও তীর্থযাত্রা উভয় ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধ এবং এর সম্ভাবনাও অপরিসীম। ভগবান রামের জন্মস্থান হোক বা কৃষ্ণের বৃন্দাবন, ভগবান বুদ্ধের সারনাথ বা কাশী বিশ্বনাথ, সন্ত কবিরের মাঘর ধাম বা বারাণসীতে সন্ত রবিদাসের জন্মস্থান আধুনিকীকরণ– রাজ্য জুড়ে ব্যাপক কাজ চলছে। ভগবান রাম, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধের জীবন সম্পর্কিত রামায়ণ সার্কিট, আধ্যাত্মিক সার্কিট এবং বৌদ্ধ সার্কিট তৈরি করা হচ্ছে। যুগ যুগ ধরে ভারতে চারধাম যাত্রা তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, শক্তিপীঠ ও অষ্টবিনায়ক দর্শনকে জীবনের অন্যতম প্রধান অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই তীর্থযাত্রা একজন পর্যটকের কাছে ভ্রমণের আকর্ষণের চেয়েও বেশি; কারণ এই সকল তীর্থযাত্রা মানুষকে তাঁদের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে, তাঁদের আলোকিত করে। এটি মাথায় রেখে, উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ ধামে একটি পর্যটন সুবিধা কেন্দ্রের বিকাশ করা হচ্ছে, সেই এলাকার বাসিন্দাদের সুবিধার্থে একটি নতুন হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে ভক্তদের

কাছে পরিষেবা দ্রুত পৌঁছবে। চারধাম সড়ক প্রকল্প বর্তমানে পুরোদমে চলছে। কেদারনাথ পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি 'ক্যাবল কার' তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তা ছাড়া, পবিত্র হেমকুণ্ড সাহেবে যাতে সহজে যাওয়া যায় তার জন্য একটি রোপওয়ে নির্মাণের কাজ চলছে। তা ছাড়া হৃষিকেশ ও কর্ণপ্রয়াগের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলছে। সমুদ্র দর্শন পথ, গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের প্রদর্শনী এবং শপিং কমপ্লেক্স সম্প্রতি পর্যটকদের পছন্দের জায়গা হয়ে উঠেছে। এর ফলে নতুন সম্ভাবনা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এবং স্থানটির মাহাত্ম্য বদ্ধি পাবে। আদিবাসীদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনি এবং তাঁদের সংস্কৃতি প্রদর্শনের জন্য স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের সময় দেশজুড়ে ১০টি আদিবাসী জাদুঘর তৈরি করা হয়েছে। রাঁচিতে বিরসা মুণ্ডাকে উৎসর্গ করে জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে। গুজরাটের রাজপিপলা, অন্ধ্রপ্রদেশের লাম্বাসিঙ্গি, ছত্তিসগড়ের রায়পুর, কেরালার কোঝিকোড়, মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা, তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ এবং মণিপুরের তামেং-এ শীঘ্রই এ ধরনের জাদুঘর দেখা যাবে।

এই জাদুঘরগুলো শুধু দেশের নতুন প্রজন্মকে আদিবাসীদের গৌরবময় অতীতের সঙ্গে পরিচিত করবে না, তাঁরা এই স্থানগুলোতে পর্যটনকেও উৎসাহিত করবে। উত্তরপ্রদেশে মহারাজা সুহেলদেবের একটি ৪০ফুট ব্রোঞ্জের মূর্তি পর্যটকদের তাঁর জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। এই স্থানে অসংখ্য সুযোগ-সুবিধার ফলে পর্যটন ক্ষেত্রের প্রসার হবে। এই সমস্ত পদক্ষেপ পর্যটনস্থলগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধিই শুধু করবে না, বরং পর্যটকদের সংখ্যাও বাড়িয়ে তুলবে।

স্বাস্থ্য-সুস্থতা পর্যটনে নতুন মাত্রা

কিছু মানুষ ভাবতে পারে যে, পর্যটনের সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির কী সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যের সঙ্গে পর্যটনের একটি শক্তিশালী যোগসূত্র তখনই গড়ে ওঠে যখন একটি দেশের সমন্বিত শক্তিশালী স্বাস্থ্য পরিকাঠামো পর্যটন ব্যবসায় প্রভাব ফেলে। শিল্প সংস্থা এফআইসিসিআই-এর একটি সমীক্ষা অনুসারে, বিশ্বব্যাপী চিকিৎসা পর্যটনের ২০ শতাংশের বেশি স্থান অধিকার করেছে ভারত। এর প্রাথমিক কারণ হল যে, ভারতে চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের তুলনায় ৫০% কম। এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমাগত মনোযোগের ফলে, ২০১৪ সাল থেকে কোভিডের ঠিক আগে পর্যন্ত চিকিৎসা পর্যটন খাতে ৩৫০% বেশি বৃদ্ধি হয়েছে। ২০১৪ সালে এই ক্ষেত্র থেকে রাজস্ব আয় হত ১.২৩ লক্ষ কোটি টাকা, কিন্তু ২০১৯ সালে তা বেড়ে ২.১০ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। অর্থাৎ, বৃহত্তর স্বাস্থ্য পরিকাঠামো পর্যটনের সুযোগ বৃদ্ধি করে। আতিথেয়তা ও চিকিৎসা পরিষেবা একসঙ্গে কাজ করবে। আজ, স্বাস্থ্য পর্যটনের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের তিনটি প্রধান দেশের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য সুস্থতা পর্যটনের প্রাথমিক লক্ষ্য হল অসুস্থতার চিকিৎসা করা এবং সুস্থতার প্রচার করা। আয়ুর্বেদ ও ঐতিহ্যগত চিকিৎসা আমাদের চিকিৎসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আয়ুর্বেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের সম্প্রসারণও দেশে পর্যটনসম্পর্কিত স্বাস্থ্য ও বিকাশকে বৃদ্ধি করবে। প্রকৃতিগত দিক থেকে ভারতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কল্পনা করুন, যেমন কেরালার সবুজ পরিবেশ- নদী- সমুদ্রের মনোরম পরিবেশ, বা উত্তরাখণ্ডের কোনও এক পাহাড়ের কোলে নদীর তীরে যোগব্যায়াম অনুশীলন করা বা উত্তর-পূর্বের সবুজ অরণ্য–ভারতের প্রকৃতি ভারতের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

যখন স্বাস্থ্য ও সুস্থতার পর্যটনের কথা আসে, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'যদি আপনার জীবনে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিয়ে থাকে,

কেভাদিয়া: বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের প্রতীক

গুজরাটের কেভাদিয়া এক সময় প্রত্যন্ত গ্রাম ছিল। এটি এখন বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। স্ট্যাচু অফ ইউনিটি কেভাদিয়ার উন্নয়ন যাত্রার প্রতীক। এই মূর্তি দেখতে স্ট্যাচু অফ লিবার্টির থেকে বেশি পর্যটক ভিড় করেন। মূর্তি উদ্বোধনের পাঁচ বছরের মধ্যে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি দেখতে পাঁচ মিলিয়নেরও বেশি পর্যটক এ গ্রামে এসেছেন। কোভিডের সময় বন্ধ থাকার পর, এটি এখন আবার পর্যটকদের ভিড়ে মুখরিত হয়ে উঠছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে, কেভাদিয়ায় প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ পর্যটক যাবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

- পরিবেশ সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পিতভাবে কেভাদিয়া অর্থনৈতিক ও পরিবেশগতভাবে বিকশিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কেভাদিয়াকে একটি প্রধান পর্যটন গন্তব্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। আগেকার দিনের কথা ভাবলে সেটাই স্বাভাবিক মনে হবে। কারণ তখন কোনও সড়ক যোগাযোগ ছিল না, রাস্তায় আলো ছিল না, রেল বা পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থাও ছিল না।

- এখানকার অন্যতম প্রধান ভ্রমণস্থলগুলো হল: স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, সর্দার সরোবর, বিশাল সর্দার প্যাটেল জুলজিক্যাল পার্ক, আরোগ্য বন, জঙ্গল ভ্রমণ ও নিউট্রিশন পার্ক। এখানে একটি গ্লো গার্ডেন, একটি ইউনিটি ক্রুজ ও ওয়াটার স্পোর্টসও রয়েছে।

- এই ধরনের পর্যটন বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা নতুন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন, কাজের সুযোগ আসছে। স্থানীয় হস্তশিল্পজাত পণ্যগুলোর কেন্দ্র হয়ে উঠেছে 'একতা মল'। আদিবাসী গ্রামে, বাড়িতে থাকার জন্য প্রায় ২০০টি কক্ষ নির্মাণ করা হচ্ছে। কেভাদিয়া রেলওয়ে স্টেশনে আদিবাসী আর্ট গ্যালারি এবং ভিউয়িং গ্যালারি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে সেখান থেকে স্ট্যাচু অফ ইউনিটির এক ঝলক দেখা যায়।

- একইভাবে, গুজরাটের কচ্ছ, যা একসময় জনশূন্য ছিল, এখন দেশ ও বিশ্বের একটি প্রধান পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কচ্ছ উৎসব সারা বিশ্বের পর্যটকদের আকর্ষণ করে। রণ উৎসবের সময় আনুমানিক ৪-৫ লক্ষ পর্যটক সাদা মরুভূমি এবং নীল আকাশের সৌন্দর্য উপভোগ করতে যান।

তাহলে এখনই প্রকৃতির কোলে নিজেকে সমর্পণ করে দিন। আপনি যখনই আপনার শরীর বা মনকে সুস্থ করতে চান তখনই ভারতে আসুন।' এই অঞ্চলে পর্যটন বৃদ্ধির জন্য ভারত জাতীয় আয়ুষ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন স্ট্রাটেজি ২০১৪-২০২৩ ভারতের আয়ুর্বেদ এবং অন্যান্য ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এছাড়াও, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভারতে ট্র্যাডিশনাল মেডিসিনের জন্য একটি গ্লোবাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছে। সারা বিশ্ব থেকে শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই আয়ুর্বেদ ও এর চিকিৎসা ব্যবস্থা অধ্যয়ন করতে ভারতে আসছে। যাইহোক, কোভিড মহামারি পর্যটন শিল্পে একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু, টিকাকরণের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশি ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। এর টিকাদান অভিযানে, ভারত পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত রাজ্যগুলোকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ভারত সরকার এই সেক্টরের জন্য টিকাদানকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, এবং ফলস্বরূপ, মহামারিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটন শিল্প খারাপ অবস্থা থেকে পুনরুদ্ধার করছে বলে মনে করা হচ্ছে। কোভিড থেকে সুরক্ষা ছাড়াও পরিচ্ছন্নতা এবং মৌলিক অবকাঠামোর ব্যবস্থা পর্যটকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিচ্ছন্নতা পর্যটনকে একটি নতুন জীবন দান করে। মনে করে দেখুন ২০১৪ সালের আগে আমাদের শহরগুলোর পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কেবল নেতিবাচক কথাবার্তা শোনা গিয়েছিল। বড় শহরগুলোর জীবনের স্বাভাবিক অংশ হয়ে উঠেছিল অপরিচ্ছন্নতা-আবর্জনা। পরিচ্ছন্নতার প্রতি উদাসীনতা কেবল শহরগুলোর সৌন্দর্য এবং দর্শনার্থীদের উপরই নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তা নয় বরং এর ফলে শহরের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যের উপর সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। এই দৃশ্যপট পরিবর্তন করার জন্য দেশে স্বচ্ছ ভারত মিশন এবং আমরুত মিশনের অধীনে একটি বিশাল অভিযান শুরু করা হয়েছিল কয়েক বছর ধরে, শহরগুলোতে ৬০ লক্ষেরও বেশি ব্যক্তিগত শৌচাগার এবং ছয় লক্ষেরও বেশি কমিউনিটি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। ৭ বছর আগে পর্যন্ত যেখানে মাত্র ১৮ শতাংশ বর্জ্য ফেলা যেত, আজ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ শতাংশে। এখন স্বচ্ছ ভারত অভিযান ২.০-এর অধীনে, শহরগুলোর আবর্জনার পাহাড় অপসারণে একটি অভিযানও শুরু হয়েছে। এলইডি আলো শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সরকার প্রচারাভিযানের আওতায় দেশে ৯০ লক্ষের বেশি পুরনো রাস্তার আলোয় এলইডি আলো লাগিয়েছে। স্বাধীনতার ৭৫তম বছরে আমাদের দেশটি 'সকলের সঙ্গে, সকলের বিকাশ, সকলের বিশ্বাস'-এর সঙ্গে 'সকলের প্রয়াস'-এর ডাক দিয়েছে। পরিচ্ছন্নতার জন্য, প্রত্যেকের অবদানের এই চেতনা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পরিচ্ছন্নতা সুখ ও পর্যটনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে, নরেন্দ্র মোদী পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ জোর দিয়ে অগ্রগতির জন্য পর্যটন স্থলগুলোর বিকাশে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। নির্মল গুজরাট অভিযান যখন গণআন্দোলনে পরিণত হয়, তখন রাজ্যে পর্যটনের প্রসারও হয়। পরম্পরা রক্ষা করে ভারত বিশ্বের পরিচয়ে পরিণত হচ্ছে।

ঐতিহ্য ও পর্যটন দুটি বিষয় যা ভারতীয় সংস্কৃতি, অনুভূতি এবং পরিচয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদা ভারতের সাংস্কৃতিক সম্ভাবনাকে একটি নতুন আলোতে বিশ্বের সামনে রাখার চেষ্টা করেছে, যাতে ভারত ঐতিহাসিক পর্যটনের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। এই চেতনায় ঐতিহাসিক স্থানগুলোর সংস্কার করা হচ্ছে এবং আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে। কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই, আহমেদাবাদ ও বারাণসীর মত ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোকে নতুন সাজে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এই শহরগুলোতে নতুন গ্যালারি, প্রদর্শনী, থিয়েটার, নাটক ও সংগীত পরিবেশনার অবকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী পাঁচটি মডেল জাদুঘর নির্মাণেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বিশ্বের প্রাচীনতম জাদুঘরগুলোর মধ্যে একটি হল কলকাতার জাদুঘর, সেখান থেকেই এর কাজ শুরু হয়েছে। তা ছাড়াও, দিল্লি, চেন্নাই হায়দ্রাবাদ ও শ্রীনগরের জাদুঘরগুলো সংস্কার করা হচ্ছে। গত সাত বছরে ১০টি অতিরিক্ত স্থানকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

দেশের পরম্পরা ও ঐতিহ্য রক্ষা, সুসজ্জিত ও সুন্দর করার জন্য শুধুমাত্র সম্পদেরই প্রয়োজন হয় না, সেগুলোর যত্ন ও পরিচালনার জন্যও উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজনীয়। এর আলোকে 'ডিমড ইউনিভার্সিটি'র মর্যাদা-সহ একটি 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হেরিটেজ কনজারভেশন' প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা হচ্ছে। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বা এখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ধোলাভিরাতে ঐতিহাসিক সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধারের কাজ করেছেন। ভারতে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিকাঠামো এবং সমন্বিত উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সার্কিট ট্রেনগুলো পর্যটন গন্তব্যগুলোকে সংযুক্ত করছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মত উৎসবগুলো ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্বের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত করছে, তাদের আকৃষ্ট করছে। এছাড়াও, দেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াটি নজিরবিহীন হারে এগিয়ে চলেছে। ১৯৭৬-২০১৪ সালের মধ্যে, শুধুমাত্র ১৩টি চুরি যাওয়া মূল্যবান সম্পদ ফিরে পাওয়া গিয়েছিল; ২০১৪-২০২১ সালের মধ্যে এরকম ৪১টি ঐতিহ্যবাহী সম্পদ ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে, কোভিডের পরে, ভারতের পর্যটন ক্ষেত্র দ্রুত তার আগের অবস্থায় ফিরে আসছে। ২০২২ সালের মার্চের মধ্যে ৫ লক্ষ বিদেশি পর্যটককে বিনামূল্যে ভিসার ব্যবস্থা করা, দ্রুত টিকাদান, স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে আরও বেশি সুবিধা এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতীয় পর্যটন বিশ্বে নিজের একটি পরিচয় গড়ে তুলতে প্রস্তুত। যাইহোক, ভারতকে বিশ্বের সেরা পর্যটন গন্তব্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সমস্ত ভারতীয়দের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন, যাতে এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত-এর চেতনা সারা বিশ্বে অনুভব করা যায়। ভারতের এই মাটিতে-এই মহামিলন তীর্থে সকলের মধ্যে যেন শুভ চিন্তার উদয় হয়।

দ্রুত যোগাযোগের ওপর গুরুত্বারোপ

পর্যটনের জন্য দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত গত সাত বছরে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। রাস্তা, রেল বা বিমানবন্দরের অবকাঠামো যাই হোক না কেন, বিশ্বমানের অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ভ্রমণকারীরা এখন এমন এলাকা পরিদর্শনের অনুমতি পাচ্ছেন যা আগে অকল্পনীয় ছিল।

- ১৩,৩৯৪ কিমি রাস্তা তৈরি হয়েছে, কোভিড সত্ত্বেও ২০২০-২১ আর্থিক বছরে এই কাজ হয়েছে।
- ৭৫টি নতুন বন্দে ভারত ট্রেন আগামী দুই বছরে চালু হবে।
- জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য বেড়ে ১,৩৭,৬২৫ হয়েছে। ২০১৪ সালে তা ৯১,২৮৭ কিমি ছিল।
- প্রতিদিন ৩৭ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে ভারত।
- ভারতে জলপথের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১১১টি হয়েছে। ২০১৪ পর্যন্ত এই সংখ্যা ছিল পাঁচটি।
- ২০২৪-২০২৫ সালের মধ্যে এনএইচএআই দ্বারা নির্মিত জাতীয় মহাসড়কগুলো ২ লক্ষ কিলোমিটার প্রসারিত করা হবে।
- উড়ান স্কিমের অধীনে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে বিমানবন্দর, হেলিপোর্ট এবং জলের এয়ারড্রোমের সংখ্যা ২২০টি পর্যন্ত বাড়ানো হবে।

প্যালেস অন হুইলসের পরে, মহারাজ এক্সপ্রেস এবং রামায়ণ সার্কিটের মত থিমভিত্তিক ট্রেনগুলো এখন চালু হচ্ছে। প্রথম বন্দে ভারত ট্রেনটি বারাণসী এবং কাটরার মধ্যে এবং দ্বিতীয়টি কাটরা থেকে দিল্লি পর্যন্ত চলাচল করছে।

উড়ান স্কিম পর্যটনের গতি বাড়িয়েছে

• একটা সময় ছিল যখন পর্যটনের প্রেক্ষাপটে ভারতের কয়েকটি নির্বাচিত স্থানের উল্লেখ করা হত, কিন্তু ভারতের মত বৈচিত্র্যময় দেশে বহু পর্যটনস্থল রয়েছে।

• বহু বছর ধরে সেই সকল স্থানগুলো অবহেলিত ছিল। এই ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সেই স্থানগুলোতে পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে সরকার 'উড়ান স্কিম' চালু করেছে।

• পর্যটকরা অসুবিধা এবং ভ্রমণের দূরত্বের কারণে যে সমস্ত পর্যটনস্থানে যেতে পারছেন না, সেসব পর্যটন কেন্দ্রের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

• কর্ণাটকের হাম্পি অন্যতম উদাহরণ। ২০১৯ সালে ৫২টি সেরা দর্শনীয় স্থানের মধ্যে এটি দ্বিতীয় পছন্দের স্থান ছিল। কিন্তু ইউনেস্কো-স্বীকৃত এই জায়গায় পৌঁছানো খুব কঠিন ছিল। যাইহোক উড়ান প্রকল্পের অধীনে, সরকার হাম্পিকে বেল্লারি ও বিদ্যানগর বিমানবন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। বিদ্যানগর বিমানবন্দর এখন হাম্পি থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সিকিমের পাকিয়ং বিমানবন্দরও এর একটি চমৎকার উদাহরণ।

• উড়ান স্কিমের তৃতীয় ধাপে, ২৯টি অতিরিক্ত বিমান পথ, তারপরে চতুর্থ ধাপে ৩৪টি পথ চালু করা হয়েছিল। এখন, উত্তরাখণ্ডের পান্তনগর, পিথারোগড়, উত্তরপ্রদেশের কুশিনগর, অরুণাচল প্রদেশের পাসিঘাট ও অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনুলের মত জায়গায় পর্যটনের প্রসার হয়েছে।

সাংস্কৃতিক পর্যটনের প্রচার কাশী-বিশ্বনাথ করিডোর

• ৮০০ কোটির টাকার বিশ্বনাথ করিডোর প্রকল্প ২০১৯ সালে শুরু হয়েছিল।

• মোট পাঁচ লক্ষ বর্গফুট আয়তনের করিডোরের প্রথম অংশটি উদ্বোধন করা হয়েছে।

• ৪৩টি অন্যান্য মন্দিরের মত কাশীর মন্দিরটি রাজকীয় সাজে সজ্জিত করা হয়েছে।

• সোমনাথ মন্দির: ২০২১ সালের আগস্টে প্রধানমন্ত্রী তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প উদ্বোধন করেছিলেন।

• রাম মন্দির পুনর্গঠন: ২০২০ সালের আগস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এটি ২০২৫ সালের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

• কেদারনাথ ধাম দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাঁচবার কেদারনাথে গিয়েছেন। ২০১৩ সালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এই মন্দির পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে। মন্দিরের অংশ হিসেবে শঙ্করাচার্যের সমাধি ইতিমধ্যেই সেখানে নির্মিত হয়েছে।

• শীতলানাথ মন্দির: কাশ্মীরে ৩১ বছর পর ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে শীতলানাথ মন্দিরটি খোলা হয়েছিল। ৩৭০ ধারা অপসারণের পর কেন্দ্রীয় সরকার মন্দিরের পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়া শুরু করে।

স্বদেশ দর্শন:
ভারতের বৈচিত্র্য সংরক্ষণের একটি উদ্যোগ

ভারতের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য পর্যটন উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রচুর সুযোগ প্রদান করে। এই কথা মাথায় রেখে ২০১৫ সালে স্বদেশ দর্শন স্কিম চালু করা হয়েছিল।

• রামায়ণ সার্কিট ॥ কৃষ্ণ সার্কিট ॥ বৌদ্ধ সার্কিট ॥ উত্তর-পূর্ব সার্কিট ॥ হিমালয় সার্কিট ॥ উপকূলীয় সার্কিট ॥ মরুভূমি সার্কিট, আদিবাসী সার্কিট ॥ ইকো সার্কিট ॥ বন্যপ্রাণী সার্কিট ॥ গ্রামীণ সার্কিট, আধ্যাত্মিক সার্কিট ॥ হেরিটেজ সার্কিট ॥ তীর্থঙ্কর সার্কিট ও সুফি সার্কিট। এই প্রকল্পের অধীনে ভারতে ১৫টি থিমযুক্ত সার্কিটের মধ্যে এই স্থানগুলো ছিল।

স্কিমটি শুরু হওয়ার পর থেকে, এই সার্কিটগুলোর নির্মাণের জন্য প্রায় ৫৭০০ কোটি টাকার মোট ৭৮টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই তহবিল থেকে ৪২০০ কোটি টাকারও বেশি খরচ করা হয়েছে।

• একটি দেশের পর্যটন শিল্প তার আন্তর্জাতিক পরিচয় সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করে। ভারত আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে একটি বিশেষ গন্তব্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, যার মধ্যে ১৯টি বিশেষ পর্যটন ক্ষেত্র রয়েছে।

• কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ, রাজ্য ও স্থানীয় সরকারের সহায়তায় এই প্রয়াস বাস্তবায়িত হচ্ছে।

• এই ১৯টি স্থানের মধ্যে আগ্রার তাজমহল থেকে দিল্লির কুতুব মিনার, মহারাষ্ট্রের অজন্তা-ইলোরা গুহাগুলো অন্তর্ভুক্ত। যোগাযোগ ব্যবস্থা, গন্তব্যস্থানে পর্যটকদের জন্য আরও ভাল সুযোগ-সুবিধা/অভিজ্ঞতা, দক্ষতা উন্নয়ন, স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ, প্রচার এবং ব্র্যান্ডিং ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়গুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এই পরিকল্পনা করা হয়েছে।

• কোভিডের সময় পর্যটন ক্ষেত্র সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অংশীদারদের কাছ থেকে গাইডদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল।

প্রসাদ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিকাঠামো উন্নয়ন

• ২০১৪ পর্যটন মন্ত্রক প্রসাদ কর্মসূচির সূচনা করে। ন্যাশনাল মিশন অন পিলগ্রিমেজ রিজুভিনেশন অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল, হেরিটেজ অগমেন্টেশন ড্রাইভ (আদ্যাক্ষর মিলিয়ে প্রসাদ) একটি কেন্দ্রীয় তহবিল সহায়তাপুষ্ট কর্মসূচি।

• এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল দেশের ঐতিহ্যবাহী ও পুণ্যস্থানগুলোর মানোন্নয়ন তথা সেগুলো চিহ্নিতকরণ এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা।

এর প্রধান লক্ষ্য হল একটি ব্যাপক ধর্মীয় পর্যটন অভিজ্ঞতা প্রদানের পাশাপাশি তীর্থস্থানগুলোর অগ্রাধিকার ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন।

• এটি রাস্তা, রেল, টার্মিনাল, মোবাইল, ইন্টারনেট-হট-স্পট অ্যাক্সেস, শৌচাগার, কারিগর বাজার, এটিএম ও অর্থ বিনিময় কাউন্টারের মত পরিকাঠামো বিকাশে কাজ করে। এর অধীনে ২৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৭টি স্থান রয়েছে।

• ২০২১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত প্রাপ্ততথ্য অনুসারে, ২৪টি রাজ্যে প্রায় ১১৬০ কোটি টাকার ৩৬ টি প্রকল্পে কাজ শুরু হয়েছে।

২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত চিকিৎসা পর্যটনের উদ্দেশ্যে ভারতে আগত মানুষের সংখ্যা

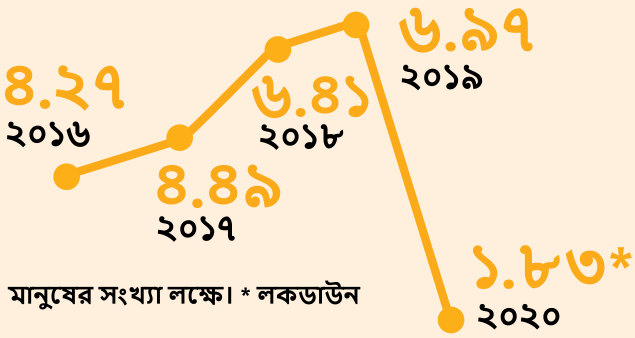

মানুষের সংখ্যা লক্ষে। * লকডাউন

ক্রমবর্ধমান পর্যটন ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা

ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অ্যান্ড ট্রাভেল কাউন্সিলের গবেষণা অনুসারে, কোভিডের আগে বিশ্বব্যাপী পর্যটন খাত প্রতি বছর ৩.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই খাতের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে ৮:৯ ট্রিলিয়ন ডলার যোগ হয় এবং ৩৩০ মিলিয়ন মানুষের কর্ম সংস্থান হয়। ভারতে এই খাতে ৮৭.৫ মিলিয়ন মানুষ কাজের সুযোগ পান এবং দেশের জিডিপিতে ১৯৪ বিলিয়ন ডলার যুক্ত হয়।

ট্রেকিংয়ের জন্য পর্বতারোহণের অনুমতি

২০১৯ সালের আগস্টে সরকার ট্রেকিংয়ের জন্য পর্বতারোহণের ভিসা পেতে ইচ্ছুক বিদেশিদের জন্য ১৩৭টি পর্বতশৃঙ্গ আরোহণের অনুমতি দিয়েছে। এই শৃঙ্গগুলো জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড ও সিকিমে অবস্থিত। উত্তরাখণ্ডে বিদেশিদের জন্য সর্বোচ্চ ৫১টি পর্বতশৃঙ্গের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় জম্মু ও কাশ্মীরের ১৫টি পর্বতশৃঙ্গও স্থান পেয়েছে। সরকার অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমকে উৎসাহিত করতে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

'ঐতিহ্য গ্রহণ'-এর অনন্য উদ্যোগ

২০১৭ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে পর্যটন মন্ত্রক 'ঐতিহ্য গ্রহণ করুন' নামে একটি অনন্য প্রকল্প চালু করেছে। এটি পর্যটন মন্ত্রক, ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের গৃহীত একটি পর্যটন প্রচার উদ্যোগ। এটি আমাদের সমৃদ্ধশালী ও বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের স্মৃতিসৌধের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। এই উদ্যোগটি ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের মূল স্মৃতিস্তম্ভ থেকে শুরু হয়েছিল এবং এখনও পর্যন্ত সারা দেশে ৯৫টি স্মৃতিস্তম্ভের উপর কাজ করেছে। বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা এসব স্থানের রক্ষণাবেক্ষণসহ মৌলিক ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দেবে। এই পরিকল্পনার ফলে এখন পর্যন্ত ২৯টি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

'দেখো আপন দেশ'-এর প্রস্তুতি

ভারতে দীর্ঘকাল ধরে বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা বজায় রয়েছে। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হোক বা দার্জিলিং আসামের বিখ্যাত চা বাগান হোক, প্রতিটি আন্তর্জাতিক দর্শনার্থী এখানকার মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের উপাসক হয়ে উঠেছেন। এর পাশাপাশি মানুষের মধ্যে ধর্মীয় স্থানগুলো ভ্রমণের ইচ্ছা পরিলক্ষিত হয়েছে। সরকার 'দেখো আপন দেশ' কর্মসূচি চালু করেছে, যার লক্ষ্য বিশেষ ট্যুরিস্ট ট্রেনের মাধ্যমে তীর্থস্থানগুলোর সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করা। এটি একটি প্রচারাভিযান যাতে মানুষ ভারতের মধ্যে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করতে পারেন এবং দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন করতে উৎসাহিত বোধ করেন। এর লক্ষ্য হল দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে সুযোগ-সুবিধা ও পরিকাঠামোর বিকাশ করা।

তথ্য ও হেল্পলাইন

- অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সুবিধার্থে ও নিরাপত্তার জন্য, টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০১১১৩৬৩ ও সংক্ষিপ্ত কোড ১৩৬৩-এর মাধ্যমে হিন্দি ও ইংরেজিসহ বারোটি ভাষায় সপ্তাহের সাত দিন ২৪ ঘণ্টা সমস্ত পর্যটন-সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা হয়।

- ভ্রমণকারীদের কোন বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে তাঁদের সাহায্য করার জন্য পর্যটন মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে একটি লাইভ চ্যাটের সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে।

- 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া ওয়েবসাইটে গুগুল ৩৬০ ডিগ্রি ওয়াকফ্রু ব্যবহার করে ভারতের পর্যটনস্থাগুলো সম্পর্কে সমস্ত তথ্য ভার্চুয়াল মাধ্যমে দেখা যেতে পারে। সমস্ত তথ্য যেমন ট্যুর অপারেটর, হোটেল, এজেন্ট ও গাইড 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া' মোবাইল অ্যাপেও উপলব্ধ রয়েছে।

- আন্তর্জাতিক দর্শনার্থীদের পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট কোভিড-১৯শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'স্ট্রান্ডেড ইন ইন্ডিয়া' পার্টোলের মাধ্যমে কোভিডের সময় ভারতে আটকে থাকা বিদেশি পর্যটকদের সাহায্য করা হয়েছিল। সূত্র: নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

পর্যটনক্ষেত্রের প্রসার ঘটলে দরিদ্র মানুষরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হন; তাঁরা কাজের সুযোগ পান; অন্ততপক্ষে, মূলধন বিনিয়োগ সর্বাধিক কর্মসংস্থান প্রদান করে। যখন পর্যটন বৃদ্ধি পায়, বিদেশি পর্যটকরা বিভিন্ন এলাকায় ভিড় জমান এবং অর্থ ব্যয় করেন। ২০১৪ সালে পর্যটন খাতে ভারত ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছিল। অপরদিকে ২০১৮-২০১৯ সালে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কবিতা

সন্ধ্যাভাষা

সোহরাব পাশা

পৃথিবীতে ভালবাসার চেয়ে মহৎ সৌন্দর্য নেই

চোখের গোপন দেখা নিবিড় স্পর্শের শব্দ-ঘ্রাণ
যেতে যেতে ফিরে তাকানো– না যাওয়া আসা
তরুতলে অন্তরালে কোথাও লেগে থাকে মানুষের ভালবাসা
মন পোড়ে– তার বুকে ছিল কাঠমল্লিকার বন
ঠোঁটের আড়ালে কেঁদে মরেছে না বলা সন্ধ্যাভাষা

বিভ্রমের কালোছায়া ফেলে অনন্তের নিঃস্বকাল
না ফেরা ভ্রমণের অন্যপাশে থাকে ভোরের স্মৃতি
জীবনের আলোছায়া গল্প
অন্ধ বাউল গূঢ় অন্ধকারে খোঁজে প্রাণের কড়ি
ধলপহরে সন্ধ্যের তারা
মেঘের আকাশ নেই ঈর্ষার আগুনে ঢালে জল
ভুল ঘরে পা রাখার সন্তাপ জ্বলে মানুষের বুকে

নিয়ত বিখ্যাত ভালবাসার আঙুল মৃত্যুকেও
আঁকড়ে থাকে মগ্নতায়

মুখোমুখি

এস এম তিতুমীর

তথাপি গেলাম। তার সৌন্দর্যে
যুগল ফোঁটা উপুড় আকাশের বুকে
পাখিদের সাথে গান করে, উড়ে উড়ে
বিবিক্ত নেমে আসি পায়ের কাছে।
গন্ধ পাই আজন্ম জামফুল। মেঘধুতুরার
কলমি বনে ফোটা গর্ভকুসুম, নাগলিঙ্গম
বিবিধ বাতাসের।
অতঃপর শিমুল উরুর আকীর্ণতা বেয়ে
সমুদ্র এল শিকড়ের শাখাতে শাখাতে
চোখের পাতাতে পাতাতে। আপেল বীজ-
কোষাবরণ। শান্তি-স্বর্গ উৎকীর্ণ আয়োজনে
উঠে এলে হাতের তালুতে
খুঁজে পাই আঙুর বন। অমৃত স্বাদ মুখবিবরে
রাঙা হয় জিহ্বার আনন্দ দেশ
এভাবেই যদি মুখোমুখি কেটে যায় অনন্তকাল
মন্দতো হয় না, লাগে বেশ

শেলী সেনগুপ্তার কবিতা

ভাগ্য

কে কার নিয়ন্তা?
মানুষ ভাগ্যের
নাকি ভাগ্য মানুষের,
নিয়তির কাছে পরাজিত মাতৃ-উপগত ওডিপাস
পিতৃহন্তারক,
পাপমুক্তির কাঙ্ক্ষায় লেইয়াসও নিমজ্জিত
পাপের সাগরে,
তারও আগে থেকে
খেলছে মানুষ ভাগ্যের সাথে,
আমিও...,
সাপলুডু খেলায় নামছি লেজের ডগায়
আবারও উদ্ধত পা রাখছি মইয়ে,

যদি সাথে থাকো
এবার আমিই নিয়ন্তা আমার ভাগ্যের
ইচ্ছের লাঙ্গলে কর্ষিত হবে করতল-রেখা...

প্রেম ও ভাল থাকার মন্ত্র

শাঁখের ধ্বনি
পাখির কলকাকলি
কিংবা
নদীর কলতানে
জেগে ওঠে প্রেম...
শরীর ও মনে দুলে ওঠে প্রেম,

আমি বার বার আলোড়িত
আমি বার বার নিবেদিত
প্রেম ও প্রার্থনার কাছে
ভাল লাগা এবং ভাল থাকার কাছে,

জীবন উদ্‌যাপন শেষে
আমি আমার কাছে শিখেছি
প্রেম ও ভাল থাকার মন্ত্র...

শীত সমাচার

শীত যখন গা মাখামাখি করে বসল
আমি ভাবলেশহীন দুর্যোগ-রাতের কথাই ভাবছিলাম,
শীত যখন চিবুক ছুঁয়ে দেখল
আমি দিদিমার আঁচলের নিচে একটি মেয়েবেলা খুঁজছিলাম

শীত যখন ফিরে যাচ্ছিল
দক্ষিণ খোলা বারান্দায় চিলতে রোদের কাটাকাটি দেখছিলাম,

শীত চলে যেতেই
ম্যাক্সিম গোর্কির মা পাঠে আমার মাকে পেয়েছিলাম...

শীতকালীন সবজির বাড়তি দাম দেখে

ইলিয়াস বাবর

শীতকালের নয়া তরকারীতে শুটকি জমে
দাদিজানের এমন কথা শুনেছি বাবার মুখে।

এখন সে-স্বাদ নেই শুটকির বুকে
বিষ আর বাঁশের ছড়াছড়ি নষ্ট করেছে সব
ওদিকে, শীত-সবজির নবাবী-স্বভাব
মুদ্রাস্ফীতির জোয়াল ধরে লকলকে আত্মীয়তা
তার গায়ে ধরেছে আলগা চিকনাই।

টাটকার নামে ফ্রিজের বাসি খাবার
গরম করে খাচ্ছি, বেশ তো–
এইসব দিনাতিপাতের ভেতর একা ভাল
লাইক-কমেন্ট নিয়ে যারা সুখী, তাদের কথা ভিন্ন
দাম ভাবে না, চেনে না তারা অপচয়!

যারা কাঁধে নেয় অদৃশ্য দেয়াল
ফুটানি মারে নিম্নমানের গোলাপ নিয়ে
ভাবতেই স্থির হয় বাবার চেহারা
কেন-না, দাদিজানের উদ্ধৃতিতে উজ্জ্বল হত তার মুখ!

আচ্ছা, পরের কথা বলতে কী সুখ জাগে মনে?
সেটা কি শুকিয়ে দেয় বিকারের ক্ষত?

ছত্রিশ জৈন্তা পাহাড়

গাফ্‌ফার মাহমুদ

ইচ্ছেগুলো পুষে রাখি বুকে
সাত সমুদ্র সুদূরে তট
সাঁতরিয়ে ছোঁব
বুকের ছত্রিশ জৈন্তা পাহাড়।

গতি, ছন্দময় হাঁটা
হেঁটে যাও রোজ
দৃষ্টিজুড়ে আনত বুক
সম্মুখে দুলছে জৈন্তা পাহাড়।

কবেই ছুঁই না মেঘরঙ চুল
ব্রার ফাঁক গলা ছত্রিশ বুক
এভারেস্ট জয়ে উদ্ধত যেই
কেবলই উঁকি জৈন্তা পাহাড়।

তাজিনডং, চিম্বুক চূড়
তেষ্টা মেটাতে চলি বহুদূর
গোয়াইনঘাট দৃঢ়তা বেশ
রোজই হাসে জৈন্তা পাহাড়।

ফেলে দেয়া কাগজ

মিতুল সাইফ

বড় দেরী হয়ে গেল
ট্রেন ছেড়ে গেল আমার আগেই
ফাঁকা স্টেশন আমার মত হাহাকার করে আছে
যত্র তত্র ছড়ানো ছিটানো
ফেলে দেয়া কাগজের ওড়াউড়ি
তারা আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে
বড় আপন সে দৃষ্টি
যেন– 'এসো ঝরা পাতা একসাথে উড়ি
পড়ে থাক যা কিছু হারিয়ে গেছে।
এসো ছেড়ে এসো
এসো ফেলে এসো
এসো ভুলে সব
মুছে দিয়ে এসো সব পিছুটান
কবিতার মোহ
বালিকার প্রেম
ফাগুন বাতাস
শত অধিকার মিছিলের দাবি সব ছেড়ে এসো
সুতো কাটা ঘুড়ি আকাশে বাতাসে
পেখম ছড়ায়।'

নলতা থেকে নন্দীপাড়া

রনি অধিকারী

কপোতাক্ষের ঘোলাজলে মিশে গেছে জীবনের গতি-প্রকৃতি, সমস্ত রহস্য গ্লানি... নলতার বড় রাস্তা ধরে এঁকেবেঁকে চলে গেছে হাজার স্বপ্ন, রথ... বাস্তবতা, জীবন-প্রকৃতি। সে ইতিহাস নবগঙ্গায় থমকে গেছে ঢের। আগুনের নদী হয়ে এভাবে জীবন চলে বোধহয়! এক দুই তিন; দিন-মাস-বছর-শতাব্দী চলে যায়... অতঃপর টালিগঞ্জের কর্পোরেট বাণিজ্য কিংবা মতিঝিলের পুঁজিবাদ নোতুবা আধিপত্যবাদ রহস্য ভেদ করে ফিনিক্স পাখি হয়ে উড়ে যায় মহাশূন্যে; শূন্য থেকে শূন্যতায়। মূলত হওয়া উচিত ছিল শাহবাগের গণবিস্ফোরণ নিয়ে এপিক সাহিত্য অথবা, 'উত্তম দাশ'কে নিয়ে বায়োপিক ডকুফিচার। জীবনের সমস্ত গতি-প্রকৃতি আজ ফিকে হয়ে গেছে... কী এক অদ্ভুত রহস্য! এভাবে রাস্তার শেষে রাস্তা খুঁজে ফেরা পথভোলা এক নির্মম রহস্য... অলিতে-গলিতে আজও ভিড় করে, নলতা থেকে নন্দীপাড়া।

মধ্যবর্তী

শৈলজানন্দ রায়

নিশীথ, রাত্রি কিংবা রজনী নিয়ে নিশ্চয় কোনও সমস্যা নেই– অন্ধকার মুখ্য বিহিত। তোমার রাতের ঘন অন্ধকারের অর্চনার আগে আমি সামান্য আলো গোধূলির, যেখানে সূর্যাস্তই প্রধান পুরোহিত। রক্তের আকাশ বেয়ে অনুপম হাঁসপাখি ঘরে ফেরে শিরশির!

ঢেউ দেখে দেখে কতকাল আমি ক্লান্ত বালুচর। এ সমুদ্রের দুই তীর– একদিকে ঝড়, অন্যদিকে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। আর সেইসাথে পোহানোর আকাঙ্ক্ষায় হাহাকার ঝরে পড়ে বিরহী নিশির!

ভোরে তোমাকে ডাকব– দেখি, আগেই পাখিরা ডেকে যাচ্ছে জোরে। তোমার শেষরাতের স্বপ্নের বাইরে আমি সামান্য একবিন্দু শিশির!

বিশেষ, আমার মনে হয় জীবন তো পাখির মত মাঝপথে উড়ে উড়ে শেষ। কিংবা হালকা অসমাপ্ত কিচিরমিচির!

ছোটগল্প

তন্বী তমালিকা

দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি

তাল-তরমুজে তারাগঞ্জ তরতাজা। তাতে ত্রিবেদীদের তাঁবু। ত্রৈলোক্যনাথ ত্রিবেদী তারাগঞ্জের তারকেশ্বর ত্রিবেদীর তনয়। তারকেশ্বর ত্রিবেদী তর্করত্ন। তিনি তারাপতির তপস্যায় ত্রিবেণীর তীরবর্তী তপোবনে তপস্যারত। তপোবলে তিনি তাপস। ত্যাগে ততধিক তন্ময়। তিরানব্বই-এ তিনি তিরোহিত। তাঁরই তনয় ত্রৈলোক্যনাথ ত্রিবেদী।

ত্রৈলোক্যনাথ তৎকালীন তড়িৎশক্তির তত্ত্বাবধায়ক। তড়িৎশক্তির তত্ত্বাবধানে তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি। তথ্যানুসন্ধানের তদারকিতেও তিনি তৎপর। তেলকুচকুচে তনু, তবুও তিনি ত্যাগী। ত্যাগেই তাঁর তৃপ্তি। তৃষ্ণা তার তৃণ-লতার তদারকিতে, তন্ময়তা তাল-তমালে। তরতাজা তরুরাজির তারুণ্যে তিনি তুষ্ট। তুষ্ট তিনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ তৃণভোজীদের তুষ্টিতেও।

ত্রৈলোক্যনাথের তনয়া তমালিকা। তমালিকা ত্রয়োদশবর্ষী তরুণী। তিলোত্তমা তমালিকা তুলনাহীনা। তনুতে তিল, তরুণিমায় তমালিকা ত্রিজগতে ত্রুটিহীন। তার তারুণ্যে তরুণেরা তো তন্ময়। তমালিকার তরে তরুণে তরুণে তর্কাতর্কি। তারা তৃষ্ণাতুর। তুষানলে তাদের তনু তপ্ত, তাপক্লিষ্ট। তদুপরি তমালিকা তাদের তল্লাটে তেজস্বীতায় তেজস্বিনী। তরুণদের তোষণে তমালিকা তুষ্টিহীন।

ত্রিলোকের ত্রাতা ত্রিভঙ্গমুরারির তুষ্টিতে তমালিকা তিলে তিলে তৈরি। তমালিকা তানপুরাতে তপস্বিনী। তার তৃপ্তি তানপুরার তানে। তাই তিনি তানপুরার তপস্যায় তুষ্ট। তালকানা তরুণদের তেলেসমাতিতে তমালিকা তিক্ত। তার তর্জনে তরুণেরা তাড়িত।

তিরস্কৃত তরুণদের তালিকায় তারাপদ তস্কর, তারিণীকান্ত তবলচি, তোলারাম তালেবর, তাগড়া ত্রিদীপ, তমাল তন্তুবায়, তুলনাহীন তুহিন, তুখোড় তাপস, তোতলা তৈমুর, তাঁবেদার তুকারাম, তরতাজা তুলসীদাস, তামসিক তারাচাঁদ, তারকেশ্বর তর্কালঙ্কার, ত্রিলোচন তরফদার, তারা তেরজন। তমালিকার তাড়াতে তটিনীর তটে তাদের তর্জন-গর্জনে তৎকালীন তারকাসুরও তটস্থ। তমালিকার তথ্যানুসন্ধ্যানে তার তল্লাটে তাকানোই তাদের তিতিক্ষাহীন ত্রুটি।

তারপর তমালিকাকে তরুণ ত্রিলোচন তরফদারের তত্ত্বলিপি–

তমালিকে,
তুমি তথ্যভাষী। তোমার তরে ত্রিলোচন তৃষিত। তুমি তিলোত্তমা। তোমার তরঙ্গায়িত তটিনীর তরঙ্গমালায় ত্রিলোচন তলিয়েছে। তোল তারে তটভূমিতে, তেজস্বিনি। তোমার তরে ত্রিলোচন ত্যাজ্যপুত্র। ত্রিলোচনের তিমিরে তুমি ত্বিষাম্পতি। ত্রিভুবনে তুমিই তৃপ্তিদায়িনী। তাড়াতাড়ি তরাও তারে, তিলোত্তমে, তবেই তুমি ত্রাণকর্ত্রী। তুলিতে তুলেছি তোমার তৈলচিত্র। তোমার তুলনা, তমালিকে, তুমিই। ত্রিলোচনের তৈরি তাজমহলে, তেজোময়ী, তুমি তাজা তরুণী, তপোবনে তপোধন। তোমার তপস্যাতে তনু-মন তার তরঙ্গায়িত।

তাকাও তো তুমি, তন্বীতমালিকে, তোমার তপস্যারত ত্রিলোচনের তৃষিত তল্লাটে। ত্র্যহস্পর্শের তরে ত্রিলোচনের তপস্যা তৃণাসনে। তোলপাড় ত্রিলোচনের ত্রিভুবন তোমারই তরঙ্গাভিঘাতে, তরঙ্গিণি। তার তানপুরার তারে তোল 'তথাস্তু' তান। তালে তালে তোল ত্রপিত তোষণ।
তোমারই
ত্রিলোচন তরফদার
তেইশ তারিখ
তারাগঞ্জ।

ত্রিলোচনের তত্ত্বলিপিতে তমালিকা তলে তলে তরল। তার তনু-মনে তারুণ্যের তৃষ্ণা। তাই ত্রিলোচনের তেজি তত্ত্বলিপিতে তমালিকার তরঙ্গোচ্ছ্বাস। তার তত্ত্বলিপিতে তমালিকার তত্ত্বজ্ঞান তছনছ। ত্রিলোচনই তার তুষ্টি, ত্রিলোচনই তার তীর্থভূমি। তমালিকা তৃপ্ত তেজস্বী ত্রিলোচনের তেজোরূপে। তারপর তার তপস্যায় তমালিকার তনু-মনে তুফান। তমালিকার তালিকায় ত্রিলোচনই তাৎপর্যপূর্ণ। ত্রিলোচনের তরি তরঙ্গায়িত তমালিকা তটিনীর তীরে। তদুপলক্ষে তৃষ্ণাতুর তমালিকাকে ত্রিলোচন তরফদারের তরফের তিনবার তোফা তোপধ্বনি।

সি দ্ধা র্থে র সং সা র

সিদ্ধার্থ সিদ্ধপুরুষ। সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট সে। সিদ্ধার্থের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সত্যি সুনিপুণ। সঞ্চিত সম্পদই সিদ্ধার্থের সম্বল। সুকীর্তিতে সিদ্ধার্থের সুখ্যাতি স্বতঃসিদ্ধ। স্বীয় সদনে স্বল্প স্বস্তিতেই সিদ্ধার্থের স্বর্গসুখ। সকালে স্বচ্ছ সলিলে স্নানসহ সে সকল সন্ধ্যাহ্নিক সারে সময়েই। সন্ধ্যার সন্ধ্যাহ্নিক সারে সন্ধ্যাতেই। সময় সচেতন সিদ্ধার্থ সকাল সকাল সারে স্নানাহার। 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'– সেই সূত্রে সিদ্ধার্থের সিদ্ধান্ত সর্বত্রই সমাদৃত।

সিদ্ধার্থ সমাজকর্মে স্নাতকোত্তর। সমস্ত সাবজেক্টেই সে সর্বাধিক সফল। সুগন্ধি স্নো-পাউডারে সে স্পৃহাহীন। সাধারণ সাজসজ্জাতেই সে সন্তুষ্ট। সান্তাহার স্টেশনের সন্নিকটে সূত্রাপুর সাকিনে সিদ্ধার্থের সাজানো সুখের সংসার। সত্যি সত্যি সাজানো সুখের সংসার সিদ্ধার্থের। স্বীয় সদনে সহধর্মিণী সাবিত্রী, সাথে সহোদর সমীরণ, সহোদরা সারদা, সন্তান স্নেহাশিস্ সহ সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুপরিকল্পিত সংসার। সোনায় সোহাগা স্বরূপ সংসারটির সকল সদস্যের সহযোগিতায় সর্বাঙ্গীণ সাফল্য সর্বজনবিদিত। সংসারে সকলে সহানুভূতিশীল, সকলে স্বাস্থ্যবান-স্বাস্থ্যবতী। স্বোপার্জিত সম্পদে সিদ্ধার্থ-সাবিত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যের সংসার সত্যি সর্বোত্তম। সকলেই সুশিক্ষিত, সকলেরই সদাচরণ সুমধুর।

সহধর্মিণী সাবিত্রী সতী-সাধ্বী। সে সাংঘাতিক সাংসারিক। সাধ্যমত সাজগোজ, সহিষ্ণুতায় সীমাহীন সাধনা। সে সকলের স্নেহাকাঙ্ক্ষী। সোনাদানা সীমিত। সাধারণ সংস্কৃতিমনা, সুশিক্ষিতা সাবিত্রী স্পষ্টবাদিনী। স্পৃহা সৃষ্টিকর্তার সংকীর্তনে। স্তম্ভিত সে স্বধর্ম সংহারকদের স্বার্থ সিদ্ধিতে। স্বার্থান্বেষীদের স্বার্থপরতায় সতী-সাধ্বী সাবিত্রী সাধারণত সর্বতোভাবে সহনশীল। সকলের সাথে সদ্ব্যবহারই সাবিত্রীর সর্বাপেক্ষা সুকীর্তি। সাবিত্রীর সন্দেহ স্বামী সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসী সেজে সাবিত্রীকে সুকৌশলে সরাবে। সেটা সুদুরপরাহত। স্বামী সোহাগিনী সাবিত্রীর স্মৃতিশক্তি সুতীক্ষ্ণ। সর্বক্ষণ সে স্বামী সিদ্ধার্থের সিদ্ধান্তে সজাগ।

সিদ্ধার্থের সহোদর সমীরণ। সাংঘাতিক সাংবাদিক সে। সংবাদের স্বার্থে সে সর্বদা সাঁটলিপিতে সজাগ। সমীর সাঁতারু। সাঁতারে সর্বাধিক সুখ্যাতি সমীরের। সাঁতারে সমীরের সম্ভবত সাতটি স্বর্ণপদকসহ সাতটি সার্টিফিকেট সঞ্চিত। সাঁতারে সমীরের সম্প্রীতি, সাঁতারেই সমীরের সমৃদ্ধি। সাঁতার সম্মেলনে সমীরের সম্মানজনক সরকারি স্বর্ণপদকগুলো সঞ্চিত। সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে সমীরের সাঁতারের সংবাদ সর্বাগ্রে সম্প্রচারিত। সাঁতারে সাহসই সম্বল, সম্প্রচারে সম্প্রসার। সাবাস সমীর, স্বচ্ছ সলিলে স্বচ্ছন্দে সাঁতরাও সারাজীবন। সুনাম-সুযশ-স্বর্ণপদক-সার্টিফিকেটসহ সকল সম্পদ সমীরের সম্মুখে সমুপস্থিত। সাঁতার সমরাঙ্গনে সমীরকে সুস্বাগতম্। সিদ্ধার্থের সহোদরা সারদাসুন্দরী। সারদার সুখ্যাতি সংগীতে। সংগীত সংক্রান্ত সকল সুসংবাদে সে সাতিশয় সন্তুষ্ট। সংগীত সকলের সান্ত্বনা, সুখহীন সংসারে সুশীতল সমীরণ সদৃশ। সুতরাং সমারোহে সংগীত সাধনা সকলেরই সমীচীন। সংগীতে সা-রে-গা-মাসহ সপ্ত সুরের সংযোজনের সার্থকতা সর্বজনবিদিত। সংগীতে সৃষ্টিকর্তা সন্তুষ্ট। সামবেদ সংগীতেরই সফল সংকলন। সাধক-সাধিকারা সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির স্বার্থে সকাল-সন্ধ্যা সংগীত সাধনায় সর্বতোভাবে সম্পৃক্ত।

সাবিনা-সুবীর-সত্য সাহা-সতীনাথ-সাগর সেন-সুমন-সুচিত্রা মিত্র-কুমার সানু-সন্ধ্যাসহ সকল সংগীতসাধক সংগীতে সিদ্ধহস্ত, সকলেই সর্বাগ্রগণ্য। সকলকে সুস্বাগতম। সেই সাথে সারদাকেও সুস্বাগতম সংগীত সমরাঙ্গনে।

সাবিত্রী-সিদ্ধার্থের স্নেহের সন্তান স্নেহাশিস। স্পষ্টবাদী স্নেহাশিস সাহিত্যে স্কলার। স্কুলের স্কলারশীপে স্নেহাশিসের স্থান স্থায়ী। সাহিত্য সাধনায় সে সংকল্প সংঘটনে সত্যিকারার্থে সংযমী। সে সুযোগ সন্ধানীদের সম্মান সংহারে সুদক্ষ। সে সাতিশয় সন্তুষ্ট সবটাতেই। সপ্রতিভ স্নেহাশিস সংগোপনে স্বীয় সর্বদা সোচ্চার।

সৃজনশীল সাহিত্যাঙ্গনে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য সৃষ্টিতে স্নেহাশিস্ সত্যি সফল। সৃষ্টিকর্তার স্নিগ্ধ স্নেহাশিসই স্নেহাকাঙ্ক্ষী স্নেহাশিসের স্নায়ুবিক স্পন্দন। সর্বমোট সতেরটি সফল সাহিত্যকর্ম স্নেহাশিসের সার্থক সৃষ্টি। সফল সাহিত্যাকাশে সে সুনিশ্চিত সুধাকর। স্নেহাশিসকে সকলের স্নেহাশিস্। সংক্ষেপে সিদ্ধার্থের সংঘাতহীন সংসারের সঠিক সন্দর্ভ– সাধু সজ্জনের সেবা সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত সংবাদ সিদ্ধার্থ সদনে সচরাচর স্বাভাবিক। সতী-সাধ্বী সাবিত্রী সেসব সারে সংযতচিত্তে, সাথে স্বামী সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থের সঠিক সিদ্ধান্তেই সাবিত্রী সেবাব্রতী। সকল সংক্রান্তিতে সত্যনারায়ণের সেবা, সেবায় সদ্ব্রাহ্মণ সুপুষ্পচন্দন সংগ্রহই সমস্যা। সাত সমস্যা সতের সমাধান। সংযম সাধন সত্যনারায়ণ সেবার সার সংক্ষেপ। সেবার সময় সংকীর্তনে সন্তুষ্ট সত্যনারায়ণ। সায়ং সন্ধ্যাতে সত্যনারায়ণ সেবার সিদ্ধান্ত সঠিক। সনাতন সংঘের সদস্যগণ সঠিক সময়েই সত্যনারায়ণ সেবার সিদ্ধান্তে সজাগ। স্তব-স্তুতিতে সেবা সমাপ্ত। সেবান্তে সাধারণের সেবা। সেবাতে সন্তুষ্ট সত্যনারায়ণ, সন্তুষ্ট সত্য সাধারণ। সকলের সন্তুষ্টিই স্বর্গীয় সম্পদ।

সিদ্ধার্থ সস্ত্রীক সপরিবারে সনাতন সংঘের সদস্য। সকাল-সন্ধ্যা সিদ্ধার্থরা সানন্দে সংকীর্তনে সম্মোহিত। সাধু সন্ন্যাসীরাও সন্তুষ্ট সংকীর্তনে। সাধু সন্তগণ সদলবলে সাময়িক সমাধিস্থ সিদ্ধার্থের সদনে। সাধুরা সাধারণত সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। সেজন্যে সংস্কৃত সাহিত্যে সাধুদের সচেতনতা সর্বাধিক। সকলের সুখ-সমৃদ্ধির স্বার্থে সমাগত সকলে সৃষ্টিকর্তার সমীপে সমুপস্থিত। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, সৎহীন সঙ্গে সর্বনাশ।

সদুদ্দেশ্যে সিদ্ধার্থের সাজানো সংসারে স্বর্গসুখ সুপ্রতিষ্ঠিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি শিক্ষাবিদ, কথাকার

বিজ্ঞান

সূর্যের নিকটতম প্রতিবেশী

ভার্গব বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্যের নিকটতম প্রতিবেশীকে খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। দক্ষিণ গোলার্ধের চিলি থেকে তাঁরা একটা বিশেষ ধরনের দূরবীন ব্যবহার করে অস্তিত্ব নির্ণয় করেছেন সেই প্রতিবেশীর। এটি একটি এস্টেরয়েড বা গ্রহাণু। আর এর আপাতত নামকরণ করা হয়েছে 2021PH27। এ যাবৎ দেখা এস্টেরয়েডগুলোর মধ্যে এর গতিবেগ সর্বোচ্চ। এই গ্রহাণুটি ঘুরতে ঘুরতে একসময় বুধ গ্রহের চেয়েও সূর্যের আরও নিকটে চলে আসে। আগে মনে করা হত বুধই সূর্যের নিকটতম প্রতিবেশী।

যদিও সূর্যের চারিপাশে পরিভ্রমণে এর পর্যায়কাল একশো তের দিন, যা বুধগ্রহের পর্যায়কাল ৮৮ দিন অপেক্ষা বড়, কিন্তু এর কক্ষপথটি উপবৃত্তাকার। সেটাই হয়তো এর পর্যায়কাল বুধ অপেক্ষা বড় হওয়ার কারণ। আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এটার কক্ষপথ সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের কক্ষপথের সাথে বেশ বড় একটা কোণে আনত। আর তা শুক্র ও বুধ উভয়ের কক্ষপথকে ছেদ করে যায়।

2021PH27 গ্রহাণুটির ব্যাস প্রায় এক কিলোমিটার। আর যখন সেটি নিকটতম দূরত্বে পৌঁছয় তখন সূর্য থেকে তার দূরত্ব হয় ১২ মিলিয়ন মাইল বা ২০ মিলিয়ন কিলোমিটার। সেই সময় ঐ গ্রহাণুগাত্রের তাপমাত্রা হয় ৯০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রায় সীসাও গলে যায়।

2021PH27 গ্রহাণুটি এই মুহূর্তে চলে গেছে সূর্যের আড়ালে (আগস্ট, ২০২১)। একে ভালভাবে দেখতে হলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ২০২২ সালের প্রথমদিক পর্যন্ত। তখন ওটাকে আরও ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে নির্ণয় করা হবে তাঁর নির্ভুল কক্ষপথ। শুধুমাত্র তখনই গ্রহাণুটির আনুষ্ঠানিক নামকরণ করা সম্ভব হবে।

এই গ্রহাণুটির আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর থেকে তাঁরা আগামীদিনে নির্ধারণ করতে পারবেন কোন্ কোন্ গ্রহাণু ভবিষ্যতে পৃথিবীর বুকে এসে আছড়ে পড়তে পারে।

পৃথিবীর নিকটবর্তী গ্রহাণুদের সংখ্যা গণনা করা আমাদের জন্য বেশ জরুরি। যদি আমরা সূর্য থেকে পৃথিবীর কক্ষপথের মধ্যকার গ্রহাণুর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারি যাদের মধ্যে থাকবে কিছু পৃথিবীর সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘর্ষকারী গ্রহাণুও, তাহলে এই সংখ্যাটা নির্ণয় করা সহজ হবে। এই সংখ্যা থেকে বিজ্ঞানীরা সহজেই অনুমান করতে পারবেন, কোন্ গ্রহাণু, কোন্‌দিক থেকে কবে, কখন পৃথিবীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। কার্নেগি ইনস্টিটিউশন ফর সায়েন্সের বিজ্ঞানী স্কট শেপার্ডের পরিচালনায় একদল বিজ্ঞানী এই গ্রহাণুটি আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা এটি আবিষ্কার করতে গিয়ে গোধূলিকে পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত সময় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কারণ গ্রহাণু পর্যবেক্ষণের জন্য সূর্যাস্তের ও সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্ত সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সময়। তাঁরা মনে করলেন, ওটির উৎপত্তিস্থল মূল গ্রহাণুবলয়, যার অবস্থান হচ্ছে মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথের মাঝে, কোন্ এক মুহূর্তে অজানা এক আকস্মিক মহাকর্ষীয় ধাক্কায় সে ছিটকে চলে আসে ভিতরের দিকে। এর আপাত উজ্জ্বলতা ১৯ ও পরম উজ্জ্বলতা ১৭.৭।

বিজ্ঞানীরা এটাকে প্রথম দেখেন ২০২১ সালের ১৩ই আগস্ট। গ্রহাণুটি পর্যবেক্ষণ করতে তাঁরা ব্যবহার করেন চিলিতে অবস্থিত ডার্ক এনার্জি ক্যামেরা (DECam)। এটি একটি নিয়ার আর্থ অবজেক্ট (NEO)। সূর্যের থেকে সবচেয়ে নিকটে যে বিন্দুতে গ্রহাণুটি পৌঁছয়, তার থেকে পৃথিবীর দূরত্ব যদি ১.৩ জ্যোতির্বিদীয় একক অপেক্ষা কম হয়, তবে তাকে NEO বলে। এযাবৎ আমাদের জানা ছিল বুধগ্রহই সবচেয়ে নিকট দিয়ে অতিক্রম করে সূর্যকে, আর সে দূরত্ব হচ্ছে ৪৭ মিলিয়ন কিলোমিটার, কিন্তু এই গ্রহাণুটির সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থান ২০ মিলিয়ন কিলোমিটার। ঐ সময়ই গ্রহাণুটি সবচেয়ে বেশি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানীরা ভেবেচিন্তে বলেছেন, এর কক্ষপথ পরিবর্তন হয় অতিধীরে। সে কারণে গ্রহাণুটি কোনও একসময় বুধ, শুক্র বা সূর্যের উপর গিয়ে আছড়ে পড়তে পারে, আবার সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের মহাকর্ষের প্রভাবে নিক্ষিপ্ত হতে পারে সৌরজগতের বাইরে। সৌরজগতের সৌরসমতলের সঙ্গে এর কক্ষপথের উৎপন্ন কোণ খুব বড় হওয়ায় (৩২ ডিগ্রি) একে মনে করা হয়ে থাকে এটি একটি মৃত ধূমকেতুর শব। আর গ্রহাণুটি এসেছে সৌরজগতের বাইরের কোনও স্থান থেকে।

যাক হোক, এসব নিয়ে কোনও চূড়ান্ত কথা বলার সময় এখনও আসেনি। কারণ, ন্যূনতম যেসব পর্যবেক্ষণ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা যায়, সেগুলো সব সম্পন্ন করা এখনও সম্ভব হয়নি। তার আগেই গ্রহাণুটি ফট করে চলে গেছে সূর্যের আড়ালে। সেখানে সেটি লুকিয়ে থাকবে বেশ কয়েকমাস। তবে চিরকাল সেখানে থাকতে পারবে না। ঘুরতে ঘুরতে আবার সেটা বেরিয়ে আসবে সূর্যের আড়াল থেকে। তখন আবার আমরা ওটাকে দেখতে পাব। সে সুযোগ আসবে ২০২২ সালের প্রথমদিকে। ততদিন আমাদের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

ভার্গব বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাবন্ধিক, পদার্থবিজ্ঞানী

ছোটগল্প

সূর্য যখন বুঝতে পারল

সালেহা চৌধুরী

সূর্য একজন জ্বলজ্বলে ছেলে। এতসব ভাবনা ওর মাথার ভেতরে কাজ করে যে, ও রাতে ঘুমাতে পারে না। প্রথম ভাবনা– আমাদের দেশটা কবে আরও সুন্দর হবে। যেমন সে দেখে পশ্চিমের দেশ। দেখে ছবিতে, টেলিভিশনে, সিনেমায়, বইতে। এখনও বিদেশে যাওয়া হয়নি। বাবা মোহসিন ছোটখাটো একটা কাজ করেন। কোনও এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ছোট একজন কেরাণি, যিনি একটিমাত্র পুত্রকে নিয়ে টেনেটুনে সংসার চালান। স্ত্রী মরিয়ম বিএ পর্যন্ত পড়েছিল। পাশ করেনি। বিএ পাশ হলে সেও না হয় সংসারের হাল ধরত। আরও একটা ছোটখাটো কেরাণির কাজ সংগ্রহ করত। সেটা হয়নি। গল্পের বই পড়ে। স্বামীকে বলে লিখতে। তিনি লেখেন। কিন্তু তেমন কোনও বিখ্যাত কাগজে তাঁর লেখা ছাপা হয় না। মরিয়ম বলে– যেমন তোমার মুরোদ, তেমন জায়গাতেইতো তোমার লেখা ছাপা হবে। 'ঊষাকাশে' একটা গল্প ছাপা হলে তবেই না জাতে উঠতে পারতে। মোহসিন সাহেব স্ত্রীর এসব মন্তব্য শোনেন, কিন্তু কী করবেন! 'ঊষাকাশ' নিজেদের চেনাজানা লোক ছাড়া গল্প ছাপে না।

উষার আকাশ বলে কথা! ওর সকালের গল্প ছাপাবে কেন? কেউ কেউ বলে সাহিত্য সম্পাদকের পকেট ভারি কর, তারপর ছাপা হবে। ছোটখাটো কেরাণি মোহসিন সেটা এখনও করেনি। সূর্য তেরো বছরের ছেলে। আর একমাস পরে চৌদ্দ হবে। মাথা ভর্তি দেশ উন্নতি করবার আইডিয়া।

একদিন বন্ধু তপুকে বলে সূর্য– জানিস রে তপু বিদেশে মানে পশ্চিমে কোনও ভিখারী নেই। আর দেখ আমাদের দেশে? পথে, ঘাটে, দোকানে, রাস্তায়, ব্রিজের তলায়, বাড়ির সামনে কত রকমের ভিখারী। তারা আবার যেই অঙ্গ খারাপ সেটাকেই ক্যাপিটাল বানায়। খোঁড়া হলে পা আগে দেখায়, কানা হলে চোখ, একজনের পেট যদি বড় হয় সে আগেই পেট দেখায়। মাথায় যদি বড় একটা আব থাকে সেটাই হয়ে যায় তার ভিক্ষার ক্যাপিটাল। ভাণ করে সে, আসলে ভিক্ষা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না।

তুই কী বলতে চাসরে সূর্য! ভিক্ষা করবে না ওরা?

বিদেশে যদি ভিখারী না থাকে তাহলে আমাদের দেশে কেন থাকবে?

আমরা কী আমেরিকা না ইউরোপ না অস্ট্রেলেসিয়া রে সূর্য?

তবু আমাদের উচিত নয় ওদের এনকারেজ করা। সরকার একটা বড় বাড়ি বানিয়ে সবগুলোকে সেখানে রাখতে পারে। ওরা কিছু করে পয়সা উপার্জন করতে পারে।

তুই সরকার হলে কী করবি?

আমি? যে ভিক্ষা করবে তাদের মেরে ফেলব।

তাহলে দুইদিনেই তোর সরকার শেষ।

আমি দেশটাকে পরিষ্কার করব। যাকে বলা হয় 'বেগার ক্লিনসিং'। যারা তাদের কানাচোখ আর ভাঙা পায়ের ক্যাপিটাল দেখিয়ে ভিক্ষা করবে তাদের...। এই বলে থামে সূর্য।

মেরে ফেলবি? হিটলারের মত কথা বলিস কেন রে তুই?

জানি না কেন বলি। এরপর সূর্য চুপ হয়ে যায়।

সূর্য নিজের ঘরে পড়ছে। মা মরিয়ম বলেন– এই তোর সাদেক দুলাভাই ফোন করেছেন।

সাদেক বিরাট বড় ব্যবসা করেন। ওদের এক দূর সম্পর্কের মামাতো বোনের স্বামী। এই বাড়িতে সাদেক খানের টাকা পয়সা নিয়ে প্রচুর গল্প হয়। সাদেক খান যে ওদের আত্মীয় সে কথা বলতেও সুখ। মরিয়ম মাঝে মাঝে সাদেক বাবাজির সঙ্গে স্বামীর তুলনা করে কষ্ট পায়।

কী খবর দুলাভাই?

কী খবর? আমি কিছুদিন আগে জাপান থেকে একটা মজার জিনিস এনেছি দেখতে এস।

কী মজার জিনিস?

এলেই দেখাব।

সাদেক খান সূর্যকে খুব পছন্দ করেন। নিজের ছেলেমেয়েরা যে যার মত। বাবার ইন্টারেস্ট নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। কাজেই এই সূর্যের সঙ্গে সাদেক খান যা শেয়ার করতে পারেন তা আর কারও সঙ্গে পারেন না। একজন পঁয়তাল্লিশ। একজন তেরো-চৌদ্দ। এখন তারিখ ডিসেম্বরের বারো। উনিশ হলেই ও চৌদ্দতে পড়বে। বেশ একটু ম্যাচিয়ুর ব্যাপার আছে সূর্যের মধ্যে। স্ত্রী বানুকে তিনি একদিন বলেছিলেন। তোমার এই ভাইটার ভাবনা অনেক পরিপক্ক। মনেই হয় না এত কম বয়স ওর!

কী দুলাভাই, কি দেখাবেন আমাকে? আমি সেই জিগাতলা থেকে আপনার এই রাজপ্রসাদে এলাম নানা কষ্ট করে। মা গেছেন ছবি খালার বাড়ি। বাবা বলেছেন সন্ধ্যার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তাঁর কাজের জায়গায় আমাকে যেতে হবে। সেখান থেকে বাবা নাকি কোথায় যাবেন। তারপর বাড়ি। তাড়াতাড়ি যা দেখাবার দেখান।

আসো আসো আমার বুদ্ধিমান শ্যালকপ্রবর। দেখ এবার কী এনেছি জাপান থেকে। ভাগ্যিস লাইসেন্স ছিল।

আপনি কী বলতে চান দুলাভাই আপনি আর একটি বন্দুক এনেছেন?

ঠিক তাই। একেবারে ম্যাজিকের পিস্তল। নাম 'মাক্সিম ৯'। সাইলেন্সার আর হেডগান একইসঙ্গে লাগানো। বিশটা গুলি খরচ করবার পর আবার সাইলেন্সর ফিট করতে হয়। বিশটা গুলি পর্যন্ত কোনও শব্দ হয় না।

বিশটা? দুলাভাইয়ের গোপন ঘরটা সূর্য জানে। একেবারে চোরকুঠুরি। দুলাভাইয়ের শখের বন্দুক, পিস্তল জমানোর ঘর। কিছুদিন আগে একটা 'ওয়েলরড' পিস্তল কিনেছিলেন। এখন কিনে এনেছেন 'মাক্সিম ৯'। প্রচুর টাকা খরচ হয় তাঁর এইসবে। তিনি মাঝে মাঝে শিকারে যান। তবে শিকারের বন্দুক আলাদা। সেগুলো 'ক্লোজ রেঞ্জ' পিস্তল নয়।

দুলাভাই দেখা হলে বলেন– জানো সূর্য এই 'মাক্সিম ৯' কেবল জাপানে কিনতে পাওয়া যায়। ছোট খেলনার মত জিনিসটা কিনতে পেরে মনে হল, আমার সংগ্রহে যা আছে বাংলাদেশের আর কারও সংগ্রহে তা নেই।

পপি আর বাচ্চুতো এগুলো চায় না?

পপি কবি হতে চায়। বাচ্চু নাচিয়ে। ওরা এইসব কামান-বন্দুক দিয়ে কী করবে বল?

সূর্য তাকিয়ে দেখে দুলাভাই সেই ঘরের চাবি তাঁর নিজের ঘরে বেডসাইড টেবিলের নিচের ড্রয়ারে একটা পুরনো সিগারেটের টিনে রাখেন। দুলাভাই বলেন– খাও দাও। থাকো। আমি এখন সিলেটে যাব। নতুন গার্মেন্ট কারখানা খুলছি সেখানে। তুমি থাকো। মিঠাই তোমাকে কত খাওয়ায় দেখ। মিঠু নামের আপুকে দুলাভাই ডাকেন মিঠাই। তারপর একটু থেমে বলেন– তোর বাপটা কাজেকর্মে উন্নতি করতে পারছে না কেন বলতো?

বাবা সময় পেলেই গল্প লেখেন। বই করবেন। একশোটা গল্প শেষ হলেই বই। মা বলেন, 'উষাকাশে' তোমার গল্প ছাপে না, তোমার কোনও জাত নেই।

বাবা বলেন– ছাপাবেন একদিন। মায়ের কথা শুনে বাবার মুখটা কেমন কালো হয়ে যায়।

ওই শালা সম্পাদক সবাইর লেখা ছাপায় না। মোটা গোঁফ আর পেশিসর্বস্ব একটা আকাট। নতুন একটা অফিস করেছে বারিধারায়। ভাবখানা এই বারিধারায় অফিস বানিয়ে তিনি মহাজাতে উঠে গেছেন। যেন আল্লাহর নেইবার। যাকগে যে যেমন। ওসব নিয়ে ভাবিস না। স্ত্রীকে ডাক দেন– মিঠাই ওকে পেট পুরে খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।

দুলাভাই আপনারতো মোটা গোঁফ আছে?

আমি কী ওই শালার মত। দুলাভাইয়ের কথা শুনে মনে হল তিনিও গল্প পাঠিয়েছিলেন, ছাপা হয়নি। মিঠুআপু বলেছিলেন এমন কোনও কথা। তিনিও পাঠিয়েছিলেন মিঠুআপুকে ইমপ্রেস করতে। কিন্তু গল্পটা ছাপা না হলেও তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। কেন যে একজন গল্প লিখে ভবিষ্যত বউকে ইমপ্রেস করতে যায় কে জানে! সূর্য একটু ভাবে।

দুলাভাই চলে গেলেন। সূর্য এবার চুপচাপ দুলাভাইয়ের চোরকুঠুরিতে আসে। ওর ইচ্ছা এই খেলনার মত পিস্তলটা হাত করা। তারপর?

প্রথম ফকিরটা বসে ছিল ব্রিজের নিচে। একটা ঠেলাগাড়ি ওকে এখানে ওখানে নিয়ে যায়। ও সারাক্ষণ শুয়ে থাকে। মুখ দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করে। ওকে নিয়ে ব্যবসা করে মানুষ। টিকটিকির মত দেখতে। সূর্যের হাতে একটা শক্ত বাজার করা ছালার ব্যাগ। সেখানে পালংশাক। মিঠুআপুর রান্নাঘর থেকে নিয়েছিল সূর্য। দুলাভাই ফেরার আগেই 'ম্যাক্সিম ৯' তাঁকে ফেরত দেওয়া যাবে। নিঃশব্দে একটা গুলি খরচ করে সেই ঠেলাগাড়ির ফকিরের যন্ত্রণার অবসান করল সূর্য। কিছু মানুষের 'বিজনেস ক্যাপিটাল শেষ'। গুলিতে শব্দ নেই। সাইলেন্সার লাগানো। কেউ জানল না। যখন জানবে তখন সূর্য আশেপাশে থাকবে না। পরের জন নারী। একটু জিরিয়ে নিয়ে মোটা গদার মত পা ঠেলে সে আবার গিয়ে বসবে বাংলা একাডেমির সামনে। ভিক্ষার ক্যাপিটাল ওই পা বের করবে, ভিক্ষা চাইবে। গদার মত পা। কাছে বসে তাকে একটা গুলি উপহার দিল সূর্য। শব্দ নেই। কেউ জানল না। কষ্ট? না সূর্যের কোনও কষ্ট হয়নি। মনে হয়েছে সে নরক থেকে ওদের উদ্ধার করল। কারণ মহিলাটি মরবার আগে বলে উঠেছিল কিনা– জীবনটা বাঁচাইলা, কে তুমি বাপজান? এরপরের জন বালক। কারা যেন তার অণ্ডকোষকে বিশেষভাবে একটা অন্য অঙ্গে পরিণত করেছে। ভয়াবহ সে দৃশ্য। আর ছেলেটি লুঙ্গি তুলে সেটাই বার বার দেখায়। এই হল ওর ভিক্ষার ক্যাপিটাল। ফুলে ওঠা বিশাল বড় এক অণ্ডকোষ। একসময় গাছের নিচে বসে একটু ছেঁড়া রুটি খেতে শুরু করেছে। সূর্য ওর অণ্ডকোষে নিঃশব্দে একটি গুলি রেখে চলে এল। তারপর জায়গা বদল। এবার সূর্য এল অন্য এলাকায়। পৃথিবীর কারও মনে কোনও প্রকার সন্দেহ নেই সূর্য নামের

তেরো বছর এগারো মাসের ছেলে এসব করছে। সে ঢাকাকে ভিখারীমুক্ত করবে। এবং পারলে সারা দেশ। এরপর দুইজনকে গুলি করল একসঙ্গে। একজন অন্ধবুড়ি ভিক্ষার ফাঁকে একটু জিরিয়ে নিয়ে দুটো শুকনো রুটি বের করেছে খাবে বলে। একজন আট নয় বছরের ভিখারী ছেলে খপ করে রুটি দুটো ওর থালা থেকে তুলে নিল। সূর্য চুপচাপ দু'জনকে গুলি করে সরে পড়ল। চোর ভিখারী আর অন্ধ ভিখারী পাশাপাশি শুয়ে রইল। চোর ভিখারীর ক্যাপিটাল তার একটা কান। আর একটা নেই।

এরপর সূর্য গেল অন্য দিকে। ছালার ব্যাগ। পালংশাক মুখ বের করে আছে। তলায় আছে দুলাভাইয়ের জাপান থেকে আনা– 'মাক্সিম ৯'! কি অপরূপ! সাইলেন্সর লাগানো। বিশটা গুলির পর আর সাইলেন্সর কাজ করে না।

আরও কয়েকজন মরণঘুমে ঢলে পড়ল। ও দেখল গোনাগুনতিতে দশজন! আজকের অভিযান শেষ। ঢাকা শহর তখনও জানে না সূর্য নামের এই ছেলে কী করছে। দুলাভাই আসবেন আগামীকাল সন্ধ্যায়। দরকার হলে অভিযানে আবার সে বেরিয়ে পড়তে পারে। সন্ধ্যার আগেই ও চুপচাপ পিস্তলটাকে দুলাভাইয়ের গোপন ঘরে রেখে আসতে পারবে। বাঁকি যাদের সে মেরেছে তারাও হাত-পা ভাঙা, অন্ধ-কানা-বোবা ভিখারী। যাদের একদল লোক ব্যবসা করায়। না হলে তারা নিজেরা বাঁচবার জন্য করে। সূর্য ঠিক বুঝতে পারে না, এদের কয়জনকে ব্যবসা করানো হয় আর কয়জন নিজেরা বাঁচবে বলে এ পথে এসেছে। এবং তারা আর কিছু করবে না।

বাবা বললেন– এত দেরী যে সূর্য?

চল কোথায় যেতে হবে। কেমন একটু অন্যরকম স্বরে সূর্য বলে।– কোথায় আবার? 'ঊষাকাশে'। সম্পাদক আ সা আ ম খাদেমুল খাদেমের সঙ্গে দেখা করতে যাব। একজন সময়টা ঠিক করেছেন। তোর মা 'ঊষাকাশে' লেখা ছাপা হয় না বলে আমাকে মানুষ বলেই মনে করে না। ইজ্জত নিয়ে টানাটানি। এখন দেখা করি। তারপর যদি ছাপা না হয় অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাবা বললেন– তুই এই চেয়ারটায় বসে থাক। আমি আ সা আ ম খাদেমুল খাদেমের সঙ্গে দেখা করি।

বেশ খানিক সময় বসে আছে সূর্য। ওই ঘর থেকে কয়েকজন চলে গেলেন। বোধকরি বাবা এখন একা। সূর্য চুপ করে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখতে পায়– বাবা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। যেমন করে ভিখারিরা অনেকসময় ভিক্ষা চায়।– স্যার গল্পটা না ছাপা হলে আমার ইজ্জতই থাকবে না।

হুঁ। খাদেমুল খাদেম বাবার দিকে একবার তাকান। তারপর বলেন– আপনি নাকি আমার সাহিত্য সম্পাদককে ফোন করে বিরক্ত করেন।

স্যার! এটা একটা ইজ্জতের ব্যাপার। আমার স্ত্রী এটা ছাপা না হলে আমাকে তালাক দিতে পারেন। বাবার গলা প্রায় কান্না কান্না। তিনি ভিখারীর মত হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। আর অনুনয়ে নুয়ে পড়ে কাতর গলায় কথা বলছেন। আজ যতগুলো ভিখারী মেরেছে তাদের মধ্যে বাবাকে সবচেয়ে বড় ভিখারী মনে হয় সূর্যর। কারণ বাবার হাত আছে, পা আছে, চোখ আছে, ট্রাউজারের নিচে সুস্থ-সবল অণ্ডকোষও আছে। তবু তিনি এমন করে কথা বলছেন মনে হয় ওই লাইনে গেলে বাবা সাইন করতেন। খাদেমুল খাদেম গোঁফ পাকান। তার পেশিবহুল হাতদুটো মাথার পেছনে রাখেন। বলেন– আপনার বাড়ি বগুড়া না? বগুড়ার দৈ খাওয়ালেন না একদিন।

এটা কোনও কথা হল? কালকেই আনব।

তিনি বলেন– এবার আসুন। খবর এসেছে কে যেন দশজন ভিখারীকে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলে খুন করেছে। কেরে বাবা এমন 'এথনিক ক্লিনসিংএ' লেগেছ। দেশ ভিখারিমুক্ত করবে?

স্যার? আবার ভিখারীবাবা হাতজোড় করেন। এই খবরে তার কিছু এসে যায় না। দশজন ভিখারী গেছে। তাতে কী? তাঁর গল্প 'পারুলের প্রেম' কবে ছাপা হবে সেটা জানা অনেক বেশি জরুরি। জোড়হাতে বাবা। কাতরভাবে খাদেমুল খাদেমের দিকে তাকিয়ে আছেন।

আসুন। আসুন। খাদেমুল খাদেম ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলতে শুরু করেন। কান্নাকাঁপা গলায় বাবা বলেন– সালামআলেকুম স্যার। আমি তাহলে যাই। দৈ নিয়ে আবার আসব স্যার। বগুড়ার সেরা দৈ। এরপর খাদেমুল খাদেম বাঁ চোখ টেপেন ফোন করতে করতে। বাবা মনে হয় আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলবেন।

সারাপথ সূর্য বাবার সঙ্গে কোনও কথা বলে না।

বাবা অফিসে ফিরে এসেছেন। বস তাঁকে তলব করেছেন।

সূর্য আবার চুপচাপ বাবাকে দেখে। বাবা তেমনি হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন বসের সামনে। নানাসব সত্য-মিথ্যা বলছেন। বলছেন– ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। এই চাকরি গেলে তাঁকে ভিক্ষা করতে হবে। তার ভাষা যে-কোনও ভিখারীর চাইতেও করুণ। সূর্য বাবাকে দেখে। এমন বাবাকে ও আগে দেখেনি। বস বলেন– আমি কাল বলব। কী হবে আপনার। বাবা এগিয়ে যান টেবিলের নিচে বসের পা ধরতে। বস বলেন– এখন যান কাল কথা হবে। তিনি ঠিক চান না মোহসিন সাহেব এমন কিছু করুক। তিনি লোক খারাপ নন। তবে অফিসের নিয়ম বলে কথা! হঠাৎ অফিস ফেলে কাউকে কিছু না বলে বাবা চলে যাবেন আর সেটা তিনি মেনে নেবেন তা কি করে হয়! এ অফিস শেষ হয় সাতটায়। বস প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করেন। তিনি আশা করেন অফিসের বাকি লোকজনও তাই করবে।

আরও কিছুক্ষণ স্টাচুর মত হাতজোড় করে বাবা দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর দরজা দিয়ে বের হবেন ঠিক করেন। বস বলেন– এখন যান। বাবা আর একবার তার পা ছুঁয়ে সালাম করতে চায়। ঈদ নয় বা তেমন কিছু নয়, তারপরেও সালাম! জুতো বোধকরি মুছে দেবেন সালামের ফাঁকে।

বাড়িতে আসতেই সূর্য দেখে গ্রাম থেকে বাবার বুড়ো চাচা এসেছেন। গরীব মানুষ। মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। বাবার কাছে সাহায্য চান। বাবা তাঁকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠান। তিনি মাঝে মাঝে আসেন। বলেন হাত জোড় করে– ভিক্ষা টিক্ষা করে কিছু টাকা নিয়ে যেতে আসছি রে বাপজান। তুমি কিছু দাও। আল্লাহ তোমার ভালা করব বাবা মোহসিন। বাবা কিছু বলেন না। কেবল চেয়ে দেখেন। তার দাড়িওয়ালা বুড়ো চাচা কেমন হাতজোড় করে ভিখারীর মত তার কাছে সাহায্য চাইছে। আগামীকাল তার নিজের কী হবে তিনি জানেন না। সূর্য দেখে তাঁর ভিখারী দাদাকে। সূর্য ঠিক এইভাবে এতদিন মানুষ দেখেনি। সে দেখে যাদের সে শেষ করেছে তাদের চাইতেও কত করুণ এদের ভিক্ষা করবার ভঙ্গি। সূর্য তাকিয়ে দেখে আর দেখে।

রাতে বাবা ভিক্ষা চান মায়ের কাছে। মা যেন তাঁকে ছেড়ে চলে না যায়। খুব তাড়াতাড়ি তাঁর গল্প 'ঊষাকাশে' ছাপাবে এমন কথা বলেন। বলেন– তুমি আর একটু অপেক্ষা কর আমার গল্পটা ঠিকই 'ঊষাকাশে' ছাপা হবে। বাথরুমে যেতে যেতে সে কথা শোনে সূর্য।

মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে একটা নোট লেখে সূর্য। তার আগে তাকিয়ে দেখে খাটের নিচে সেই বাজার করবার ব্যাগ, পালংশাক আর শাকের নিচে 'ম্যাক্সিম ৯'। ও লেখে 'আমি সূর্য। দশজন ভিখারীকে আমিই মেরেছি। আর যাদের মেরেছি তারা সকলেই প্রায় বলেছে– মাইরা প্রাণটা বাঁচাইলা। নরক থেকে উদ্ধার বোধকরি একেই বলে। কিন্তু ঘটনা এই, আমাদের দেশে ও সমাজে এত সব ভিখারী সেটা ঠিক আমার জানা ছিল না। দেখলাম এই সমাজে একজন মানুষ বাঁচার জন্য, সামান্য কারণে, দিনে দিনে কেমন করে ভিখারী হয়ে যায়। এবং সে নিজেও জানে না সে ভিখারী হয়ে গেছে। সবাইকে মেরে ফেলা সহজ নয় আর ঠিকও হবে না। কাজেই একটি গুলি আমার নিজের জন্য খরচ করলাম। ভয়! হয়তো সময়ে আমিও একদিন নিজের অজান্তে একজন অনেক বড় ভিখারী হয়ে উঠব। আমি কতজনকে এই পৃথিবী থেকে সরাব? সে তো সম্ভব নয়। তাই ভিক্ষুক হয়ে উঠবার আগে নিজেই চলে যাই। ইতি সূর্য।'

সূর্যের গুলি করা দশ জন ভিখারীর ভেতর কেবল একজন বেঁচেছিল। সেই ছেলেটা। অস্বাভাবিক বড় অণ্ডকোষ দেখিয়ে যে ভিক্ষা করে। গুলিটা সেখানে আটকে ছিল। গুলি বের করা হল। ও বেঁচে গেল। এখন এই গুলির দাগ দেখতে সকলে আসে। ওর পসার বেড়ে গেছে। মরতে মরতে বড় অণ্ডকোষের ছেলেটার একটা বড় উপকার করেছে সূর্য।

সালেহা চৌধুরী
কথাসাহিত্যিক

ব্যক্তিত্ব

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

দুলাল ভৌমিক

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) বাংলা সাহিত্যের মহাকবি, নাট্যকার, বাংলাভাষার সনেট প্রবর্তক, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে, এক জমিদার বংশে তাঁর জন্ম। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন কলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল। মা জাহ্নবী দেবীর তত্ত্বাবধানে মধুসূদনের শিক্ষারম্ভ হয়। প্রথমে তিনি সাগরদাঁড়ির পাঠশালায় পড়াশোনা করেন। পরে সাত বছর বয়সে তিনি কলকাতা যান এবং খিদিরপুর স্কুলে দু'বছর পড়ার পর ১৮৩৩ সালে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শেখেন।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই মধুসূদনের প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ১৮৩৪ সালে তিনি কলেজের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ইংরেজি 'নাট্য-বিষয়ক প্রস্তাব' আবৃত্তি করে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক প্রমুখ, যাঁরা পরবর্তী জীবনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে মধুসূদন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কলেজের পরীক্ষায় তিনি বরাবর বৃত্তি পেতেন। এ সময় নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময়েই মধুসূদন কাব্যচর্চা শুরু করেন। তখন তাঁর কবিতা জ্ঞানান্বেষণ, Bengal Spectator, Literary Gleamer, Calcutta Library Gazette, Literary Blossom, Comet প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হত।

এ সময় থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন বিলেত যাওয়ার। তাঁর ধারণা ছিল বিলেতে যেতে পারলেই বড় কবি হওয়া যাবে। তাই পিতা তাঁর বিবাহ ঠিক করলে তিনি ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন, তাঁর নামের পূর্বে 'মাইকেল' শব্দটি যুক্ত হয়। কিন্তু হিন্দু কলেজে খ্রিস্টানদের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ থাকায় মধুসূদনকে কলেজ ত্যাগ করতে হয়। তাই ১৮৪৪ সালে তিনি বিশপস্ কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৪৭ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি ইংরেজি ছাড়াও গ্রিক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষা শেখেন।

এ সময় ধর্মান্তরের কারণে মধুসূদন তাঁর আত্মীয়স্বজনদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাঁর পিতাও অর্থ পাঠানো বন্ধ করে দেন। অগত্যা মধুসূদন ভাগ্যান্বেষণে ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজ গমন করেন। সেখানে তিনি প্রথমে মাদ্রাজ মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলাম স্কুলে (১৮৪৮-১৮৫২) এবং পরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হাইস্কুলে শিক্ষকতা (১৮৫২-১৮৫৬) করেন।

মাদ্রাজে অবস্থানকালেই মধুসূদন সাংবাদিক ও কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি Eurasion (পরে Eastern Guardian), Madras Circulator and General Chronicle ও Hindu Chronicle পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং Madras Spectator-এর সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন (১৮৪৮-১৮৫৬)। মাদ্রাজে অবস্থানকালেই Timothy Penpoem ছদ্মনামে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ The Captive Ladie (১৮৪৮) এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ Visions of the Past প্রকাশিত হয়। রেবেকা ও হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ এখানেই সংঘটিত হয়। মাদ্রাজে বসেই তিনি হিব্রু, ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়ান, তামিল ও তেলেগু ভাষা শিক্ষা করেন।

ইতোমধ্যে মধুসূদনের পিতামাতা মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি হেনরিয়েটাকে নিয়ে ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা আসেন। সেখানে তিনি প্রথমে পুলিশ কোর্টের কেরানি এবং পরে দোভাষীর কাজ নেন। এ সময় বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে বাংলায় সাহিত্যচর্চা করতে অনুরোধ জানান এবং তিনি নিজেও ভেতর থেকে এমন তাগিদ অনুভব করেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী (১৮৫৮) নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে উপযুক্ত নাটকের অভাব অনুভব করেন এবং মহাভারতের দেবযানী-যযাতি কাহিনী অবলম্বনে ১৮৫৮ সালে পাশ্চাত্য রীতিতে রচনা করেন শর্মিষ্ঠা নাটক। এটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক নাটক এবং মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার।

পরের বছর মধুসূদন রচনা করেন দুটি প্রহসন: একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ। প্রথমটিতে তিনি ইংরেজি শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলদের মাদকাসক্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারকে কটাক্ষ করেন এবং দ্বিতীয়টিতে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের আচারসর্বস্ব ও নীতিভ্রষ্ট সমাজপতিদের গোপন লাম্পট্য তুলে ধরেন।

মধুসূদনের কৃতিত্ব এখানেই যে, তিনি যা-কিছু রচনা করেছেন তাতেই নতুনত্ব এনেছেন। তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ বাংলা সাহিত্যে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। তখনকার বাংলা সাহিত্যে রচনার শৈলীগত এবং বিষয়ভাবনাগত আড়ষ্টতা মধুসূদন তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও দক্ষতাগুণে দূর করেন। ১৮৬০ সালে তিনি গ্রিক পুরাণের কাহিনী নিয়ে রচনা করেন পদ্মাবতী নাটক। এ নাটকে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার এটাই প্রথম এবং এর ফলে তিনি বাংলা কাব্যকে ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তি দেন। একই বছর তিনি রচনা করেন তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। পরের বছর ১৮৬১ সালে রামায়ণের কাহিনী নিয়ে একই ছন্দে তিনি রচনা করেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি মেঘনাদবধ কাব্য। এটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক মহাকাব্য। আর কোনও রচনা না থাকলেও মধুসূদন এই একটি কাব্য লিখেই অমর হয়ে থাকতে পারতেন। এই কাব্যের মাধ্যমেই তিনি মহাকবির মর্যাদা লাভ করেন এবং তাঁর আবিষ্কৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দও বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রামায়ণে বর্ণিত অধর্মাচারী, অত্যাচারী ও পাপী রাবণকে দেশপ্রেমিক, বীর যোদ্ধা ও বিশাল শক্তির আধাররূপে চিত্রিত করে মধুসূদন উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা লাভ করেন।

মধুসূদনের কাব্যে এক ধরনের নারীবিদ্রোহের সুর লক্ষ করা যায়। তাঁর কাব্যের নায়িকাদের মধ্য দিয়ে যেন যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত, অবহেলিত, আত্ম সুখ-দুঃখ প্রকাশে অনভ্যস্ত ও ভীত ভারতীয় নারীরা হঠাৎ আত্মসচেতন হয়ে জেগে ওঠে। তাঁর বীরাঙ্গনা (১৮৬২) পত্রকাব্যের নায়িকাদের দিকে

তাকালে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে। এখানে জনা, কৈকেয়ী, তারা প্রমুখ পৌরাণিক নারী তাদের স্বামী বা প্রেমিকদের নিকট নিজেদের কামনা-বাসনা ও চাওয়া-পাওয়ার কথা নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ করে। নারীচরিত্রে এমন দৃঢ়তার প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে ইতোপূর্বে আর কারও রচনায় প্রত্যক্ষ করা যায়নি। মধুসূদনের এ সময়কার অপর দুটি রচনা হল কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) ও ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১) নাটক।

১৮৬২ সালের ৯ জুন মধুসূদন ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গিয়ে গ্রেজ-ইন-এ যোগ দেন। সেখান থেকে ১৮৬৩ সালে তিনি প্যারিস হয়ে ভার্সাই যান এবং সেখানে প্রায় দু'বছর অবস্থান করেন। ভার্সাইয়ে অবস্থানকালে তিনি ইতালীয় কবি পেত্রার্কের অনুকরণে বাংলায় সনেট লিখতে শুরু করেন। বাংলা ভাষায় এটিও এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। ভার্সাই নগরীতে থাকতেই তিনি মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে নতুন ও একান্ত আপনভাবে দেখতে ও বুঝতে পারেন, যার চমৎকার প্রকাশ ঘটে তাঁর 'বঙ্গভাষা', 'কপোতাক্ষ নদ' প্রভৃতি সনেটে। এই সনেটগুলো ১৮৬৬ সালে চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী নামে প্রকাশিত হয়।

ভার্সাই নগরীতে দু'বছর থাকার পর মধুসূদন ১৮৬৫ সালে পুনরায় ইংল্যান্ড যান এবং ১৮৬৬ সালে গ্রেজ-ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন। ১৮৬৭ সালের ৫ জানুয়ারি দেশে ফিরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। কিন্তু ওকালতিতে সুবিধে করতে না পেরে ১৮৭০ সালের জুন মাসে মাসিক হাজার টাকা বেতনে হাইকোর্টের অনুবাদ বিভাগে যোগ দেন। দু'বছর পর এ চাকরি ছেড়ে তিনি আবার আইন ব্যবসায় শুরু করেন। এবার সফল হলেও অমিতব্যয়িতার কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অমিতব্যয়িতার ব্যাপারটি ছিল তাঁর স্বভাবগত। একই কারণে তিনি বিদেশে অবস্থানকালেও একবার বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যে সেবার উদ্ধার পান। ১৮৭২ সালে মধুসূদন কিছুদিন পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ দেও-এর ম্যানেজারের চাকরি করেন।

জীবনের এই টানাপোড়েনের মধ্যেও মধুসূদনের কাব্যচর্চা অব্যাহত ছিল। হোমারের ইলিয়াড অবলম্বনে ১৮৭১ সালে তিনি রচনা করেন হেক্টরবধ। তাঁর শেষ রচনা মায়াকানন (১৮৭৩) নাটক। বাংলা ভাষায় তাঁর প্রকাশিত ১২টি গ্রন্থ এবং ইংরেজি ভাষায় ৫টি গ্রন্থ রয়েছে।

মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক কবি। তিনি 'মধুকবি' নামে পরিচিত। এই মহান কবির শেষজীবন অত্যন্ত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়। ঋণের দায়, অর্থাভাব, অসুস্থতা, চিকিৎসাহীনতা ইত্যাদি কারণে তাঁর জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। অর্থাভাবে তিনি উত্তরপাড়ার জমিদারদের লাইব্রেরি ঘরে বসবাস করতেন। স্ত্রী হেনরিয়েটার মৃত্যুর তিনদিন পরে ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন বাংলার এই মহান কবি কপর্দকহীন অবস্থায় কলকাতার জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

দুলাল ভৌমিক শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

ভারতবিষয়ক কুইজ

আচ্ছা, বলুন তো?

১. কোন্ ভারতীয় শহর দু'টি রাজ্যের রাজধানী?
ক. চণ্ডিগড়
খ. কলকাতা
গ. মুম্বই
ঘ. চেন্নাই

২. ভারতের সঙ্গে কয়টি দেশের সীমান্ত আছে?
ক. ১৪
খ. ২
গ. ৯
ঘ. ৬

৩. গুজরাটের রাজধানীর নাম কি?
ক. মুম্বই
খ. গান্ধীনগর
গ. লক্ষ্ণৌ
ঘ. ভূপাল

৪. ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য কোন্‌টি?
ক. গোয়া
খ. কেরালা
গ. পণ্ডিচেরী
ঘ. উত্তর প্রদেশ

৫. দিল্লি কোন্ নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. ব্রহ্মপুত্র
খ. গঙ্গা
গ. যমুনা
ঘ. নীল

৬. এর মধ্যে কোন্‌টি ভারতীয় নদী নয়?
ক. মেকং
খ. গঙ্গা
গ. যমুনা
ঘ. ব্রহ্মপুত্র

৭. ভারতের পশ্চিমে কোন সাগর অবস্থিত?
ক. কোরাল সাগর
খ. আরব সাগর
গ. সেলিবি সাগর
ঘ. আন্দামান সাগর

৮. দাবার উৎপত্তি কোন্ দেশে?
ক. চিন
খ. ভারত
গ. ইরান
ঘ. স্পেন

৯. ভারতের কোন্ রাজ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়?
ক. আসাম
খ. কেরালা
গ. পশ্চিমবঙ্গ
ঘ. মেঘালয়

১০. কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান ভারতের কোন্ রাজ্যে অবস্থিত?
ক. গুজরাট
খ. মিজোরাম
গ. উত্তর প্রদেশ
ঘ. আসাম

১১. কোন্ শহরে প্রথম কাবাডি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়?
ক. কলকাতা
খ. বেঙ্গালুরু
গ. চেন্নাই
ঘ. মুম্বই

১২. কোন্ রাষ্ট্রপতিকে 'মিশাইল ম্যান' বলা হয়?
ক. সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণাণ
খ. কোচরিল রমণ নারায়ণ
গ. রামনাথ কোবিন্দ
ঘ. এ পি জে আব্দুল কালাম

১৩. বেঙ্গালুরু কোন্ রাজ্যে অবস্থিত?
ক. বিহার
খ. ছত্তিশগড়
গ. কর্নাটক
ঘ. কেরালা

১৪. রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের প্রেসিডেন্ট কে?
ক. আশা আম্বানী
খ. মুকেশ আম্বানী
গ. নীতা আম্বানী
ঘ. অনিল আম্বানী

১৫. ভারতের কোন নারী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি হন?
ক. ইন্দিরা গান্ধী
খ. রাজকুমারী অমৃত কৌর
গ. বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত
ঘ. সরোজিনী নাইডু

১৬. ভারতীয় রুপির নাম কি?
ক. রুপি
খ. ইয়েন
গ. ডলার
ঘ. পেশো

১৭. কোন্‌টি আলোর উৎসব?
ক. দুর্গা পূজা
খ. হোলি
গ. দিওয়ালী
ঘ. দশেরা

১৮. এঁদের মধ্যে কে শেষ মুঘল সম্রাট?
ক. মুহম্মদ শাহ
খ. দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ
গ. নাদির শাহ
ঘ. জাহাঙ্গীর

১৯. ভারতের কোন্ নাগরিক প্রথম মহাকাশে যান?
ক. কল্পনা চাওলা
খ. রাকেশ শর্মা
গ. সুনীতা উইলিয়ামস্
ঘ. রভিশ মলহোত্রা

২০. কোন্ সমাজ সংস্কারককে আধুনিক ভারতের জনক বলা হয়?
ক. রাজা রামমোহন রায়
খ. সাবিত্রী বাই ফুলে
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ঘ. বিনোবা ভাবে

২১. ভারতের জাতীয় বৃক্ষ কোন্‌টি?
ক. পীপল
খ. নিম
গ. আম
ঘ. বট

২২. এর মধ্যে কোন্‌টি ভারতের কেন্দ্রীয় ভূখণ্ড?
ক. কলকাতা
খ. শিমলা
গ. চেন্নাই
ঘ. লাদাখ

২৩. এর মধ্যে কোন্‌টি গুজরাটের সবচেয়ে জনপ্রিয় নৃত্যশৈলী?
ক. ভাংড়া
খ. কুচিপুড়ি
গ. গর্বা
ঘ. কথক

২৪. ভরতনাট্যম ভারতের কোন্ রাজ্যের নৃত্যশৈলী?
ক. পশ্চিমবঙ্গ
খ. গুজরাট
গ. কর্নাটক
ঘ. তামিলনাড়ু

[উত্তর শেষ পাতায়]

প্রবন্ধ

বহু ভাষাবিদ জনপ্রিয় লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী

পরমা

শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯০৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ভারতে আসামের অন্তর্গত সিলেটের করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ সিকান্দর আলী ছিলেন সাব-রেজিস্ট্রার। পিতার নিবাস ছিল হবিগঞ্জের উত্তরসুর গ্রামে। চাকরিসূত্রে পিতার কর্মস্থল পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নের পর মুজতবা আলী শেষপর্যন্ত শান্তিনিকেতন-এ ভর্তি হন এবং পাঁচ বছর অধ্যয়ন করে ১৯২৬ সালে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্বভারতীতে তিনি বহু ভাষা শেখার সুযোগ পান। সংস্কৃত, সাংখ্য, বেদান্ত, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ফারসি, আরবি, রুশ, ইতালিয়ান, উর্দু, হিন্দি ও গুজরাটি– এমন ১৮টি ভাষায় দখল ছিল তাঁর।

গীতা তার সম্পূর্ণ মুখস্ত ছিল। এমনকী রবীন্দ্রনাথের গীতিবিতানও মুখস্ত ছিল তার। একবার এক অনুষ্ঠানে এক হিন্দু পুরোহিত গীতা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখছিলেন। সেই সভায় সৈয়দ মুজতবা আলী উপস্থিত ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই পুরোহিত যে-সব রেফারেন্স দিচ্ছিলেন তাতে কিছু ভুল ছিল। সৈয়দ মুজতবা আলী অবশেষে দাঁড়িয়ে ওঁর সমস্ত রেফারেন্স মূল সংস্কৃত ভাষায় কী হবে তা চমৎকারভাবে মুখস্থ বলে গেলেন। সমস্ত সভার দর্শক বিস্ময়ে হতবাক।

বিশ্বভারতীর পর তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯২৯ সালে 'হুমবল্ট' বৃত্তি নিয়ে তিনি জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করেন। সেখানে তিনি দর্শন বিভাগে তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রে গবেষণা করে ১৯৩২ সালে পিএইচ ডি লাভ করেন। তিনি ১৯৩৪-৩৫ সালে মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এভাবে পড়ালেখায় তিনি প্রচুর সময় কাটিয়েছেন।

মুজতবা আলীর চাকরিজীবন শুরু হয় ১৯২৭ সালে কাবুলের কৃষিবিজ্ঞান কলেজে ফরাসি ও ইংরেজি ভাষার প্রভাষকরূপে। ১৯৩৫ সালে তিনি বরোদা কলেজে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক হন। তিনি বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবেও কিছুকাল দায়িত্ব পালন করেন। পরে পেশার পরিবর্তন করে মুজতবা আলী ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্সের সচিব ও অল ইন্ডিয়া রেডিওর কর্মকর্তা হন। সবশেষে তিনি বিশ্বভারতীর ইসলামের ইতিহাস বিভাগে যোগদান করেন। শান্তিনিকেতনে অধ্যয়নকালেই হস্তলিখিত বিশ্বভারতী পত্রিকায় তার কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়। তিনি সত্যপীর, রায়পিথোরা, ওমর খৈয়াম, টেকচাঁদ, প্রিয়দর্শী ইত্যাদি ছদ্মনামে আনন্দবাজার, দেশ, সত্যযুগ, শনিবারের চিঠি, বসুমতী, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় কলাম লিখতেন। এ ছাড়া মোহাম্মদী, চতুরঙ্গ, মাতৃভূমি, কালান্তর, আল-ইসলাহ

প্রভৃতি সাময়িকপত্রেরও তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে-বিদেশে' গ্রন্থখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই হইচই ফেলে দেয়, এবং পাঠকচিত্ত জয় করে নেয়। কাবুলে অবস্থানের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অন্তরঙ্গ উপলব্ধির ফসল এই গ্রন্থখানি।

সামগ্রিকভাবে তিনি উভয় বঙ্গে সমান জনপ্রিয় ও সমাদৃত লেখক ছিলেন। আন্তর্জাতিক চেতনায় সমৃদ্ধ এই লেখকের বিশ্বমানবিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং অনুকরণীয় রচনাশৈলী তাকে এই সম্মানের অধিকারী করেছে। তদুপরি তিনি যে নৈপুণ্যের সঙ্গে বিদেশি চরিত্র ও আবহ বাংলা সাহিত্যে এনেছেন তাও তুলনাহীন।

মুজতবা আলী বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন, কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তন করেছেন এবং বহুজনের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তাই তার লেখায় সে প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। তার রম্যবিষয়ক ছোট ছোট রচনা পাঠকদের চিত্তবিনোদন ও অনাবিল আনন্দদানে তুলনাহীন।

স্বাধীনচেতা মুজতবা আলী সারাজীবন এক ভবঘুরে জীবনযাপন করেন। কোথাও স্থায়ীভাবে থাকেননি। স্বাভাবিক জীবনযাপন করেননি। পাকিস্তানের কট্টরপন্থীরা তাকে 'ভারতের দালাল' অপবাদ দিয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল। কলকাতায় জনপ্রিয়তা, সুনাম ও পুরস্কার সবই পেলেন। তবে কলকাতার রক্ষণশীল লেখক সমাজ তাকে ঈর্ষা করত ও বলে বেড়াত যে, 'মুজতবা আলীর ধর্মনিরপেক্ষ উদার দৃষ্টিভঙ্গি একটা আইওয়াশ, আসলে আলী একজন ধুরন্ধর পাকিস্তানি এজেন্ট।' এক দুর্বল মুহূর্তে দুঃখ করে তিনি তার গুণগ্রাহী বিখ্যাত লেখক শংকরকে বলেছিলেন, 'এক একটা লোক থাকে যে সব জায়গায় ছন্দপতন ঘটায়, আমি বোধহয় সেইরকম লোক।'

'বই কিনে কেউ কখনও দেউলিয়া হয় না' এই ডায়লগটি কিন্তু সৈয়দ মুজতবা আলীর। বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের কারণে ১৯৪৯ সালে তিনি অর্জন করেন নরসিং দাস পুরস্কার। এ ছাড়া ১৯৬১ সালে অর্জন করেন আনন্দ পুরস্কার।

পাণ্ডিত্য আর হৃদয়বেত্তার সঠিক আনুপাতিক মিশেলে যিনি হাস্যরসকে বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, কিছুটা প্রতিষ্ঠান বিরোধী, বর্ণময় এই মানুষটির জীবন পুরোপুরি রবীন্দ্ররসে জারিত ছিল। আলি সাহেব নিজেই লিখেছেন 'এ আমি নিশ্চয় করে জানি যে, আমার মনোজগৎ রবীন্দ্রনাথের গড়া।'

এই বিশিষ্ট মানুষটি শান্তিনিকেতনে ছাত্র হিসেবে আসেন ১৯২১ সালে। তখন মুসলিম ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে অনেক আশ্রমিকেরই আপত্তি ছিল। কিন্তু জহুরির চোখ মহামূল্যবান রত্নটিকে চিনতে ভুল করেনি। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছেতেই সব বাধা পেরিয়ে অবশেষে আশ্রমিকের তকমা জুটল তাঁর। গুরুদেবের সঙ্গে মুজতবা আলির নিম্নোক্ত আলাপচারিতায় সেই সঙ্কটের আভাস কিছুটা পাওয়া যায়– 'বলতে পারিস সেই মহাপুরুষ কবে আসবেন কাঁচি হাতে করে?

আমি তো অবাক। মহাপুরুষ তো আসেন ভগবানের বাণী নিয়ে, অথবা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম নিয়ে, কাঁচি হাতে করে?

হাঁ হাঁ কাঁচি নিয়ে। সেই কাঁচি দিয়ে সামনের দাড়ি ছেঁটে দেবেন, পেছনের টিকি কেটে দেবেন। সব চুরমার করে একাকার করে দেবেন। হিন্দু-মুসলমান আর কতদিন আলাদা হয়ে থাকবে?'

ভাবলে অবাক হতে হয় যে, এই কথোপকথনের মূল ভাবনাটি আজ প্রায় শতবর্ষ পেরিয়ে এসেও একইরকম প্রাসঙ্গিক! রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই আলিসাহেব তাঁর অনন্যতার নজিরটি রেখেছিলেন। গুরুদেব জানতে চাইলেন 'কি পড়তে চাও?' ঝটপট জবাব এসেছিল 'তা তো ঠিক জানিনে, তবে কোনও একটা জিনিস খুব ভাল করে শিখতে চাই'। যদিও গুরুদেবের দিক থেকে উৎসাহ পেলেন নানাকিছু শিখবার। তাঁর নিজের কথায় 'কাজেই ঠিক করলুম, অনেক কিছু শিখতে হবে।' রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য, আশ্রমের শিক্ষা আর বহুমুখী কর্মধারায় অবগাহন করে যেন নবজন্ম হল মুজতবার!

প্রথম প্রথম আশ্রমের অন্যরকম পরিবেশ জল, জঙ্গল, পাহাড়ের দেশ সিলেট থেকে আসা কিশোরটির ভাল লাগছিল না। তবে কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু সেই শান্তিনিকেতনই হয়ে উঠল তাঁর অবাধ বিচরণভূমি। 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী'র নবম অধিবেশনে (১৯২২) সৈয়দ মুজতবা আলী ঈদ উৎসব নিয়ে একটি প্রবন্ধ পড়েন। সেদিনের সভার সভাপতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। মূলত, গুরুদেবের উৎসাহেই তাঁর ভাবনার স্রোত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটে বেড়াতে লাগল।

'বিশ্বভারতীর সেবার জন্য যদি আমাকে প্রয়োজন হয় তবে ডাকলেই আমি আসব। যা দেবেন হাত পেতে নেব' রবীন্দ্রনাথকে কথা দিয়েছিলেন তিনি। এসেছিলেন ফিরে ১৯৫৭ সালে। ১৯৬১-র ১৮ আগস্ট ইসলামের ইতিহাস পড়ানোর কাজে যোগ দিলেন। মুজতবা আলি সে-সময় খ্যাতির মধ্যগগনে, ফলে বিড়ম্বনাও সইতে হয়েছিল বিস্তর। শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেতে চাননি। তারপরও ১৯৬৫ সালে তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল।

আলী সাহেবের কথা লিখতে গেলে তাঁর পাণ্ডিত্য, রসবোধ, বাগবৈদগ্ধ্যের কথাই আলোচিত হয় বেশির ভাগ সময়ে। মানুষ অবশ্য এতেই বেশি প্রভাবিত হন। মনেও রাখেন মজার মজার সব ঘটনা। কিন্তু হাসি-মজায় মাতিয়ে রাখা মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা। যা ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর সম্পদ।

বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন একবার এক সভায় বললেন, রবীন্দ্রনাথ ইকবালের চেয়ে অনেক বড় কবি। তা নিয়ে শুরু হল প্রবল বিতণ্ডা। মৌলবাদী ছাত্ররা প্রবল ক্ষিপ্ত। মারধর খাওয়ার আশঙ্কা। আলী সাহেবের মেজভাই সৈয়দ মুর্তাজা আলি বগুড়া জেলার জেলাশাসক তখন। তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নেন তিনি। এরপর বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষের পদ ছেড়ে দেন।

আর একবারের ঘটনা শান্তিনিকেতনে। ৭ই পৌষের উপাসনায় ছাতিমতলায় তিনি আচার্য হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের রক্ষণশীলদের কাছে সে জন্য তাঁকে কটূক্তি শুনতে হয়। যদিও তাঁর এই ভাবনাকে স্বাগত জানানোর মত উদারচিত্ত লোকের অভাব ছিল না।

সৈয়দ মুজতবা আলীর আর্থিক নিরাপত্তা বলতে যা বোঝায় সেটা কখনওই ছিল না। তিনি কখনও চাকরি করেছেন, কখনও লিখে টাকা আয় করেছেন। অন্নদাশঙ্কর রায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'মুজতবা আলী শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক চাকরি চেয়েছিলেন। কিন্তু আর্থিক কারণে তখন তাঁদের চাকরি দেওয়া সম্ভব হয়নি। আনন্দবাজার গ্রুপও তাঁকে চাকরি দেননি। পরে, শান্তিনিকেতনে মুজতবার চাকরি হয়।' শুধুমাত্র কলমকে ভরসা করে ১৯৫৭ থেকে ১৯৬১ সালের অগাস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত, হালভাঙা নৌকোর মত কোনওক্রমে নিজেকে চালিয়েছেন।

অনেকেই মনে করেন ভয়ংকর অলসতার কারণে তিনি নিজকে নিজেই ঠকিয়েছেন। সুনীতিবাবু বলেছেন, 'মুজতবা আলী তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রের প্রচণ্ড গবেষক হতে পারতেন, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে সার্থক অন্বেষণ চালাতে পারতেন, ভারতীয় ইতিহাসের অনুদ্ঘাটিত দিক উন্মোচন করতে পারতেন, কিন্তু কিছুই করেননি। শুধু ব্যঙ্গ রসিকতায় নির্বাসন দিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করলেন।' ভীষণ অগোছালো ছিলেন তিনি। মুজতবা নিজেই লিখেছেন 'হাঁড়িতে ভাত থাকলে সাঁওতাল কাজে যায় না, আর আমার ড্রয়ারে টাকা থাকলে আমি লিখি না।' তারপরেও বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ মুজতবা আলীর উপমা একমাত্র তিনিই।

বাংলা ভাষায় তিনি সরস-মার্জিত-বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যধারার প্রবর্তক। ব্যঙ্গ ও রঙ্গ-রসিকতায় তাঁর রচনা প্রদীপ্ত। অন্তত দশটি ভাষায় দক্ষতা অর্জনকারী এই বিরল-প্রতিভা ভাষাতত্ত্ব ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখে গেছেন।

তিনি জীবনের করুণ দিকগুলো সুস্পষ্টভাবে জানতেন বলেই জীবনের হাস্যরসের দিকগুলো নিপুণভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন। মূলত, জীবনের গভীর থেকে জীবনকে পর্যবেক্ষণের অন্তর্দৃষ্টি ছিল বলেই তাঁর পরিবেশিত হাস্যরসের মধ্যে পরিমিত জীবনময়তা ছিল।

১৯৭৪-এর ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকাতে তিনি চিরনিদ্রায় চলে যান! যতদিন বাংলা সাহিত্য থাকবে, ততদিন তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে পাঠকদের মাঝে বেঁচে থাকবেন।

তথ্যসূত্র

মুজতবা সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্য রচনাশৈলী- নুরুর রহমান খান
গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন– সৈয়দ মুজতবা আলী– বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
চরণ ছুঁয়ে যাই– শংকর, *আনন্দবাজার পত্রিকা*

পরমা সাংস্কৃতিক কর্মী

ছোটগল্প

চা

চিত্রালী ভট্টাচার্য

থরো চেক-আপের সমস্ত রিপোর্টে দ্রুত চোখ বোলাতে বোলাতে ডক্টর সোম গম্ভীরভাবে ব্রহ্মাস্ত্রটা নিক্ষেপ করে দিলেন, 'চা খাওয়াটা একেবারে বন্ধ করুন এবার।' উল্টো দিকে উদ্বিগ্ন মুখে বসে থাকা কর্ণ সেন যে তখন প্রকৃতই অভিশপ্ত কর্ণের মত মোক্ষম সময়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার সমস্ত কৌশল ভুলে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন, তা খেয়ালই করলেন না ডাক্তারবাবু। 'চায়ে চিনি খান?' দ্বিতীয় তির। 'হ্যাঁ, মানে চায়ে তো অল্প চিনি...' কর্ণ সেন বিড়বিড় করে কিছু একটা বলতে যেতেই ডক্টর সোম বলে উঠলেন, 'চলবে না। চায়ে চিনি দুধ সব বন্ধ করতে হবে। জানি অনেকের মত আপনিও বলবেন, তা হলে আর চা খেয়ে কী লাভ? তাই বলছি, চা খাওয়াটাই বন্ধ করুন... ড্রিঙ্ক নিশ্চয়ই করেন না এই বয়সে?' তৃতীয় তির নিক্ষিপ্ত হতেই কর্ণ সেন রুখে উঠলেন। বেশ স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'মাঝেমধ্যে বন্ধুরা একত্র হলে তো একটু-আধটু তো চলেই।' 'সর্বনাশ! এই বয়সে আবার ওসব কেন!'

'মানে! কী হয়েছে আমার? খুব সিরিয়াস কিছু কি?'

ডক্টর সোম মুচকি হেসে বললেন, 'বয়স হয়েছে আপনার, আর বয়স হলেই যে অসুখগুলো আক্রমণ করে তার প্রায় সবগুলোই ধরিয়েছেন। হাইপ্রেশার, শুগার, ক্রিয়েটিনিন লেভেলে গণ্ডগোল, লিভারটিও তেমন সুবিধের নয়। তবে খুব ভয় পেয়ে যাওয়ার মত কিছু হয়নি এখনও, সবই বর্ডারলাইনের ধারেকাছেই আছে। এখন থেকে ধরাকাটে থাকলে ভাল থাকবেন, নয়তো...' বলে চুপ করে গিয়ে দ্রুত হাতে প্রেসক্রিপশন লিখে কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এই এক, দুই, তিন নম্বরের ওষুধগুলো দু'বেলা একটা করে খাবেন আর চার নম্বরটা ঘুম না হলে। ওটা অপশনাল। এক মাস পর রিপোর্ট করবেন আমাকে।'

প্রেসক্রিপশনটা হাতে নিয়ে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসার পর জোরে একটা শ্বাস নিলেন কর্ণ সেন, তার পর হাঁটতে শুরু করলেন বড় রাস্তা ধরে। অটো বা টোটোয় চড়তে আর ইচ্ছে করল না।

আজ নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া দরকার, তাই হাঁটাই ভাল। বোঝাপড়া বলতে, এর পর কী করবেন তিনি। ডাক্তারের পরামর্শ মত সব কিছুর সঙ্গে সাধের চা-টাও বন্ধ করে দেবেন, নাকি চিনি-দুধ ছাড়া ওই ঘোড়ার ইয়ে... জিভ কাটলেন কর্ণ সেন। ছেলে-বৌমার চাপে পড়ে থরো চেক-আপ করাতে গিয়ে কী সমস্যাতেই না পড়েছেন! আরে বাবা, এই বয়সে ডাক্তারের কাছে গেলে কিছু না কিছু অসুবিধে তো বেরিয়ে আসবেই! সব নাকি বর্ডারলাইনের কাছে আছে, যত্তসব... বিড়বিড় করলেন উনি। এই বয়সে বর্ডার পেরিয়ে একটু আক্রমণ না হলে শরীর মৃত্যুর দিকে এগোবে কী করে? ভাবতে ভাবতে এগিয়ে গেলেন বাজারের দিকে।

ছোট্ট আনস্মার্ট মোবাইলটা বার করে সময় দেখলেন। রাত ন'টা। অতএব প্রতিদিন যে দোকানটার সামনে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেন, সেখানে আর কেউ নেই। বুড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির কড়া নির্দেশে রাত সাড়ে আটটার মধ্যে লেজ গুটিয়ে পালায় সব। যাঁদের গিন্নি এখনও বর্তমান, তাঁদের তবু হম্বিতম্বির একটা জায়গা আছে, কর্ণ সেনের সে সুযোগও নেই। তিন বছর হল গত হয়েছেন তিনি।

ছেলেকে কিছু বলতে গেলেই বলে, 'এখন বুড়ো হয়েছ, আমাদের কথা শুনে চললে ক্ষতি কী? আমরা তো তোমার ভালই চাই, না কি?'

এরপর কি আর কথা চলে? কর্ণ সেনও চুপ করে গেছেন। ডানা-ছাঁটা পাখির মত খাঁচার নির্দেশ মেনে নিয়েছেন। তা বলে চায়ের ওপর কোপ! ওই একটি সাধই তো টিকে আছে এখনও। দারুণ ফ্লেভারের দার্জিলিং টি, হাল্কা দুধ আর চিনি দিয়ে, দু'বেলা দু'কাপ। সেটুকুও এবার ছাড়তে হবে!

ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফিরে মনখারাপ নিয়ে না খেয়েই শুয়ে পড়লেন।

পরদিন ভোর-ভোর উঠে রোজকার মত খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে ব্যালকনির চেয়ারটায় বসতেই অনু চা নিয়ে এল। এ সময়টা খুব উপভোগ করেন কর্ণবাবু। শীতের সময়। অল্প অল্প রোদ এসে পড়েছে পায়ের কাছে। বৌমা রিমঝিমের লাগানো নানা জাতের পাতাবাহারের উপরে আলো পড়ে ঝলমল করছে। সে সবে চোখ বুলিয়ে চায়ে প্রথম চুমুকটা দিতে গিয়ে থমকালেন। কাজের মেয়েটা তখনও দাঁড়িয়ে।

কর্ণ সেন দেখলেন, তার প্রিয় ট্রান্সপারেন্ট কাচের টি-মগে গরম জলের মধ্যে একটা টি-ব্যাগ ডোবানো। উনি অনুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী এটা?'

অনু হেসে বলল, 'গিরিন টি। বৌদি বলেছে আজ থেকে এই চা খেতি হবে তোমারে। ও সব দুধ-চিনি চলবেনি, ডাগদারের বারুন।'

কোনও কথা না বলে খানিকটা দ্বিধা নিয়ে, মগটা তুলে প্রথম চুমুকটা দিতেই অনু হেসে বলল, 'ভাল?'

কর্ণ সেন ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, তুই যা, 'বলে কাগজটা মুখের ওপর তুলে পড়ার ভান করলেন।

অনু তবু কিছুক্ষণ অহেতুক দাঁড়িয়ে থেকে নিজের কাজে চলে যেতেই কাগজের আড়াল সরিয়ে ফের তাকালেন মগটার দিকে। মুখে তখনও প্রথম চুমুকের অনভ্যস্ত বিস্বাদ। আর মনে রাগ-দুঃখ-অভিমানের এক জটিল সংমিশ্রণ। সেই ফ্লেভার-সমৃদ্ধ দার্জিলিং চায়ের বদলে এই অপেয়টি তা হলে বরাদ্দ হল তাঁর জন্য! বৌমা না জানুক, ছেলেটা তো জানে তার বাবা চা নিয়ে কতটা সেনসিটিভ! এই বয়সেও কত দূর থেকে তিনি তাঁর সাধের চা কিনে আনেন! অনুও দেখেছে সে সব, তবু এভাবে...

কর্ণ সেন গুম মেরে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। তার পর ঠাণ্ডা মাথায় চায়ের মগটা তুলে সামনের পাতাবাহারের টবটায় ধীরে ধীরে ঢেলে দিয়ে ঘরে ঢুকে শালটা গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে থামলেন। খুব শান্ত গলায় ডাকলেন, 'রিমঝিম...রিমঝিম...'

ডাক শুনে বৌমার বদলে অনুই দৌড়ে এসে বলল, 'বৌদি তো বাথরুমে, কিছু বলবে?'

'তোর বৌদিকে বলে দিস, আমি একটু বেরোচ্ছি।'

'এ সময় তো তুমি কোনও দিন বেরোও না মেসো!'

'এখন থেকে বেরোব, ডাক্তারবাবু বলেছেন...' বলে কর্ণ সেন ওকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলেন।

কোথায় যাবেন তা এখনও পরিষ্কার নয়। শুধু নিজেকে সংযত করার জন্য হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে গৌড়ীয় মঠ ছাড়িয়ে ত্রিকোণ পার্কে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন, এই শীতের মধ্যেও কত জন শরীরচর্চায় ব্যস্ত। তাঁর মত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও হাঁটছেন দ্রুতবেগে। দেখতে দেখতে মুচকি হাসলেন। শরীর নিয়ে ওঁর কোনও দিনই তেমন মাথাব্যথা নেই, উনি চিরকাল ব্যতিব্যস্ত ওঁর মন নিয়ে। আর আজকের ওই গ্রিন টি-পর্ব সেই মনের উপরে এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। মনে হয়েছে, তাঁর জীবন থেকে স্বাদ আর মিষ্টতা বিদায় নিল বুঝি। কিন্তু কাকে বোঝাবেন এ সব? বন্ধুরা শুনলে হাসবে। বলবে, 'এ তোমার বাড়াবাড়ি কর্ণ। তোমার সুস্থতা নিয়ে ছেলে-বৌ কতভাবে বলো তো! তোমার তো খুশি হওয়া উচিত!'

এসব তত্ত্বকথা শুনতে আজ আর ভাল লাগছিল না, তাই বাজারের দিকে ওঁদের নির্দিষ্ট আড্ডায় না গিয়ে উল্টো পথে হাঁটতে শুরু করলেন।

এ দিকটা বড় একটা আসেন না কর্ণ সেন। বলা ভাল এড়িয়ে যান। এ তাঁর অতীতের পথ। এক সময় রোজ একবার করে এই পথ দিয়ে না গেলে তাঁর মন কেমন করত। কিন্তু কোনও এক সময় থেকে এ পথ তিনি সতর্কভাবেই এড়িয়ে গেছেন। এই দিঘির ধার, মোরামের রাস্তা, রেল কলোনির মাঠ, দীনবন্ধু পাঠাগার– এ সবের সঙ্গে পত্রালি নামটাও যে এসে পড়তে পারে সামনে, তাই এত আয়োজন, এত প্রাচীর নির্মাণ। কিন্তু আজ যে কী হল, সেই পত্রালিদের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন একেবারে! প্রায় চার দশকেরও কিছু বেশি বছর পর।

এতদিন পরেও সেই একই রকম আছে বাড়িটা। শুধু রং হয়েছে নতুন করে, আর দোতলার জানলাগুলোতেও নীলের বদলে নেটের পর্দা উঠেছে। হাওয়ায় উড়ছে পর্দা। হঠাৎ অকারণেই মনে হল, পত্রালি কি এখনও ওখানেই থাকে? আর সেই অনুষঙ্গে মনে পড়ে গেল ওর বাড়িয়ে দেওয়া প্রথম চায়ের কাপটার কথা। তখন ওদের বাড়ি প্রায়ই যেতেন উনি, পত্রালির দাদার বন্ধু হিসেবে। ডব্লুবিসিএস-এর প্রস্তুতি চলছিল দু'জনের। আড্ডাও চলত ফাঁকে ফাঁকে, আর রোজই অপূর্ব ফ্লেভার-সমৃদ্ধ দু'কাপ চা আসত ভিতর থেকে। অল্প দুধ আর চিনি দিয়ে স্পেশ্যাল দার্জিলিং টি। সেই স্বাদে মজে উঠত মন। একদিন থাকতে না পেরে জিজ্ঞেসই করে ফেলেছিলেন, 'কে করেন রে চা-টা? নিশ্চই মাসিমা? অপূর্ব স্বাদ রে! এই চায়ের জন্যই রোজ তোদের বাড়ি আসা যায়।'

অমিত হাসতে হাসতে বলেছিল, 'মা নয় রে, সে এক জন রায়বাঘিনি আছে আমাদের বাড়ি, দেখবি?'

বলেই বন্ধুকে অপ্রস্তুত করে ডেকে উঠেছিল, 'অলি... এই অলি... একবার আয় তো!' বলতেই ভারী পর্দা সরিয়ে উঁকি দিয়েছিল সুন্দর পানপাতার মত একটা মুখ, গালে টোল, চোখে অদ্ভুত দুষ্টু একটা আলো। দেখেই এক ঝটকায় ভাল লেগে গিয়েছিল কর্ণ সেনের। বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে বোকার মত তাকিয়ে ছিলেন ওর দিকে। মেয়েটি ফিক করে হেসে পর্দা দুলিয়ে চলে যেতেই সংবিৎ ফিরেছিল।

ওঁর অবাক হওয়া মুখ দেখে অমিতই হেসে বলেছিল, 'আমার বোন, অলি, মানে পত্রালি। ভীষণ মেজাজি। দুমদাম যা ইচ্ছে তা-ই করে ফেলে মার কাছে বকুনি খায় বটে, কিন্তু চা-টা বেড়ে করে। সকলেই ওর চায়ে মুগ্ধ।'

সেই স্বাদ আজও লেগে আছে মুখে। আর মন? সে যে তার পর থেকে কতবার দেখতে চেয়েছে ওই পানপাতাকে তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু দেখা হয়নি আর। প্রতিদিন চায়ের স্বাদে ভালবাসার ফ্লেভার গভীরতর হয়েছে।

তারপর হঠাৎ করেই একদিন থেকে চা আসা বন্ধ হয়ে গেল! দু'-চার দিন পর থাকতে না পেরে অমিতকে জিজ্ঞেসই করে ফেললেন, 'ব্যাপার কী?'

'অলির বিয়ে ঠিক হয়েছে রে!' খুব উত্তেজিতভাবে জবাব দিয়েছিল অমিত।

'বিয়ে!' কর্ণ সেনের মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে যেতেই অমিত অবাক হয়ে বলেছিল, 'কেন? তোর আপত্তি আছে না কি?'

'না, না, সে কী কথা! আসলে হুট করে সব ঠিক হয়ে গেল, তাই...'

'ও, তাই বল...' হেসে উঠেছিল অমিত।

সেদিন থেকে কতদিন যে অস্থির লেগেছিল! পালিয়ে বেড়িয়েছিলেন অমিতের থেকে, পাছে ধরা পড়ে যান। বাথরুমের আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ পর্যবেক্ষণ করতেন প্রতিদিন। কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো! প্রেমিকের কোনও রেখা কি ঠেলে বেরিয়েছে? শেষে বিলাসপুরে চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যেতে পালিয়ে বেঁচেছিলেন। সময় থাকতে যে সাহস করতে পারেননি, অসময়ে সে সাহস দেখানোর আর মানে খুঁজে পাননি কর্ণ সেন। নিজের মনটাকে লুকিয়ে পালিয়েই গিয়েছিলেন এক রকম।

সেই তাদের বাড়ির সামনে আজ এতদিন পর কেন এসে দাঁড়িয়েছেন কাঙালের মত? তিনি কি আসলে আসতে চাননি! বিশ্বাসঘাতক পা-দুটোই কি অবচেতনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এই কাণ্ড ঘটাল!

মনে হতেই মুখ নামিয়ে ফেরার পথে পা বাড়ালেন কর্ণ সেন, তখনই কেউ ডাকল,

‘কর্ণবাবু...’

‘কে?’ ঘুরে তাকালেন উনি। একটি ছেলে। বছর বাইশ-তেইশ।

‘আমাকে ডাকছ?’ কর্ণ সেন জিজ্ঞেস করলেন।

‘হ্যাঁ, একবার আসবেন?’

‘কোথায়!’

‘আমাদের কাফেতে। নতুন খুলেছি।’

কর্ণ সেন অবাক হয়ে বাড়িটার দিকে তাকাতেই দেখলেন, দরজার ওপর বড় একটা গ্লো-সাইন বোর্ড। লেখা ‘সেনসেশন’। কী কাণ্ড! এতক্ষণ খেয়ালই করেননি।

‘কিন্তু আমাকে তুমি কী করে...’ বলতেই ছেলেটি হাসল। বলল, ‘চিনি। আসুন না একবার।’

কর্ণ সেন বোঝা না-বোঝার মধ্যেই পা বাড়ালেন, ছেলেটির অনুরোধ রাখতে।

ভিতরটা সুন্দর ঝুলন্ত আলোয় সাজানো। মেরুন কার্পেটের ওপর সুসজ্জিত টেবিল-চেয়ার, ন্যাপকিন-স্ট্যান্ড, ম্যাট। সাউন্ড বক্সে মৃদু এলভিস প্রিসলি।

ছেলেটি একটা চেয়ার টেনে সৌজন্য দেখাল, ‘প্লিজ।’

বসলেন কর্ণ সেন। মেনু কার্ড বাড়িয়ে দিল ছেলেটা।

কর্ণ সেন হেসে বললেন, ‘না, না, এখন কিছু নয়, শুধু এক কাপ চা খেতে পারি।’

‘বেশ,’ ছেলেটি চলে গেল অন্তরালে আর অমনি উনি ফিরে তাকালেন অতীতে। এটাই তো সেই বাইরের ঘরটা! কত পাল্টে গেছে! ‘সেনসেশন’ নামটা এখন দিব্যি মানিয়েছে। মানুষও যদি এ রকম ভোল বদলে নতুন হতে পারত! ভাবনার মধ্যেই দেখলেন, ছেলেটি সুদৃশ্য চায়ের কাপ হাতে বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে। সুন্দর একটা ট্রে-র ওপর সোনালি বর্ডার দেওয়া সাদা কাপ-ডিশ। দেখে খুশি হলেন।

মুখ নামিয়ে চায়ে চুমুক দিতেই চমকে উঠলেন তিনি! চল্লিশ বছর আগের সেই স্বাদ! এও কি সম্ভব!

কর্ণ সেন জিজ্ঞাসু চোখে মুখ তুলতেই দেখলেন, পর্দা দু’হাতে চেপে ধরে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন দূরে, তাঁর পানপাতার মত মুখে বয়সের বলিরেখা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। মুখের সেই হাসি আর টোল আকর্ষণহীন, কিন্তু চায়ের সেই স্বাদ আজও এক রকম! দৃষ্টিবিভ্রম? মায়া? অলীক? তার কি এখন এখানে থাকার কথা? তার যে বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল? বেড়াতে এসেছে?

প্রশ্ন তো অনেক। কিন্তু আর কোনও উত্তর না খুঁজে চোখ বন্ধ করে ফেললেন কর্ণ সেন। তার পর গভীর শ্বাস টেনে চায়ের কাপে দ্বিতীয় চুমুক দিলেন।

চিত্রালী ভট্টাচার্য ভারতের ছোটগল্পকার

নিবন্ধ

পরাজিত মানিক

জন্ম ১৬ জানুয়ারি ১৯১০ ॥ মৃত্যু ৪ আগস্ট ১৯৩১

মৃত সন্তান জন্ম দেয়ায় মানিকের স্ত্রী ডলির অনুভূতি: ‘বাঁচা গেছে বাবা, আমি হিসেব করেছি বাড়ি ফিরে মাসখানেক বিশ্রাম করে রাঁধুনি বিদায় দেব। অনেক খরচ বাঁচবে।’ বড় একটি ভাই ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। যখন শুনেছেন ভাই গল্প লেখে, রাজনীতি করে, টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেন। মৃত্যুর আগে যখন চরম অর্থকষ্টে দিন যায়, বড় ভাইয়ের কাছে টাকা ধার চাওয়াতে উত্তর পেয়েছেন, ‘আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, আমি কাউকে টাকা ধার দিই না।’ তবু সাহিত্য দিয়ে পেট চালানোর জেদ ছাড়েননি একরোখা মানিক।

একবার পূর্বাশা পত্রিকায় চাকরির আবেদন করলেন। যখন শুনেছেন বন্ধুও একই পদে প্রত্যাশী, সম্পাদককে লিখলেন, ‘আমি অবগত আছি পরিমল গোস্বামী এই পদটির জন্য আবেদন করিবেন। আমার চেয়েও তাহার চাকুরির প্রয়োজন বেশি। মহাশয় যদি ইতিমধ্যে তাহার সম্পর্কে অনুকূল বিবেচনা করিয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহপূর্বক আমার এই আবেদন প্রত্যাহার করা হইল বলিয়া ধরিয়া লইবেন।’ সরকারি চাকরিও ছেড়ে দেন, ভাল লাগেনি বলে।

আদতে মার্কস-ফ্রয়েডের বিষম ভূত চেপেছিল তাঁর মাথায়। মধ্যবিত্তের যুদ্ধ লিখতে গিয়ে নিজের জীবনের সাথেই মহাযুদ্ধ করা হয়ে গেছে গোটা জীবনে। অথচ গণিতে বিএসসি তুখোড় ছাত্র প্রবোধকুমারের সাহিত্যিক হওয়ার কথা ছিল না। একবার ক্যান্টিনে এসে এক বন্ধু বলল, ‘পত্রিকায় লেখা দিয়েছি, ছাপায়নি। নামী কেউ না হলে ছাপায় না।’ তর্কাতর্কি করতে গিয়ে লেখা ছাপানোর চ্যালেঞ্জে নামলেন। সেই চ্যালেঞ্জই বাংলা সাহিত্যকে পাইয়ে দিল চালচুলোহীন মৃগীরোগী এক সাহিত্যিককে। ‘পদ্মানদীর মাঝি’ লিখেছিলেন জীবনের মোটামুটি ৬ ঘণ্টার অভিজ্ঞতা থেকে, তখন তিনি কিশোর। একবার বাড়ি থেকে হারিয়ে গেছেন, অনেক খুঁজে পাওয়া গেল নদীপারের জেলেদের নৌকায়। তাদের কাছে দু’বেলা ভাত খেয়ে গল্প করে কাটিয়েছিলেন মানিক। ‘প্রাগৈতিহাসিক’ গল্পের শেষ লাইন ক’টা নিজেকেই উৎসর্গ করেছিলেন কি তিনি? শেষবেলা যখন শয্যাশায়ী, তখন বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া না দেবার দায়ে মামলা ঠুকে দিয়েছেন। সে মামলা লড়ে ওঠার আগেই, বাড়ি ভাড়া না দিয়ে মানিক ফেরত যান ওপারে। সুভাষ মুখার্জি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, ‘একটা টেলিফোন তো করবেন, বৌদি।’ ডলি ম্লান হাসিতে উত্তর দেন, ফোন করলেও যে পাঁচ আনা পয়সা লাগে ভাই।’

মরার পর শত শত দেশনেতা এসে পায়ে মাথা ঠুকেছেন, হাজার হাজার মানুষ ফুলের তোড়া নিয়ে শব দেখতে এসেছেন। অথচ মৃত্যুর আগের দিনও ছিল না কারোর খোঁজ। বিস্ময়কর হলেও, জীবনে একটাও পুরস্কার-সম্মাননা পাননি আমাদের পদ্মানদীর মাঝি! মরে গিয়ে প্রথমবার বেঁচে গেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রজন্মের অনেক ‘স্যার’ লেখক এসেছেন, আরও আসবেন। কিন্তু এমন মৃগীরোগী ছন্নছাড়া জেদী মানিক একটাই, কেবল একটাই। আপনাকে ভালবাসি, মানিক। জন্মদিনে আমাদের ভালবাসা আপনি গ্রহণ করুন।

● নিজস্ব প্রদায়ক

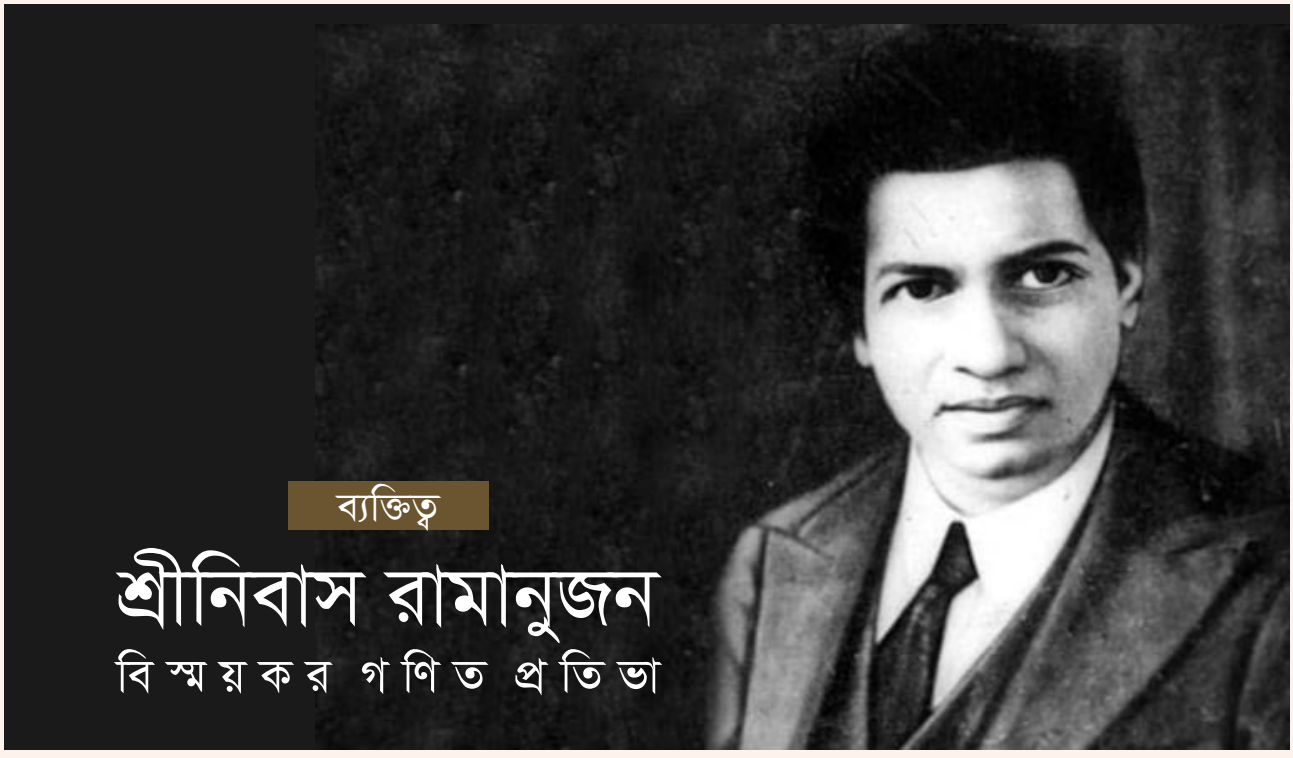

ব্যক্তিত্ব

শ্রীনিবাস রামানুজন

বিস্ময়কর গণিত প্রতিভা

শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে ফলাফল কী হবে? শ্রেণিকক্ষে এই প্রশ্নটি করেছিল এক ছাত্র। প্রশ্ন শুনে শিক্ষক হতবাক হয়ে যান এবং ছাত্ররা হাসতে থাকেন। কিন্তু এই প্রশ্নটি গণিতের সবচেয়ে কঠিন ধাঁধার সমাধানের পথ তৈরি করেছিল; যার উত্তর তখন পর্যন্ত সারা বিশ্ব খুঁজে চলেছিল। প্রশ্নকর্তা ছাত্রটি হলেন শ্রীনিবাস রামানুজন, যার গাণিতিক নীতিগুলো নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে।

রামানুজনের প্রতিভা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আহমেদাবাদের একটি অনুষ্ঠানে উপরিউক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রামানুজন এমন একজন গণিতবিদ ছিলেন যে সারা বিশ্বে তাঁর মেধার জন্য স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তামিলনাড়ুর ইরোডের একটি ছোট শহর থেকে আসা রামানুজন সেই সময়ের গণিতের ক্ষেত্রে প্রতিটি তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বের কাছে ভারতের প্রাচীন গণিত ধারণার পরিচয় তুলে ধরেছিলেন। তাঁর বাবা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এক কাপড় ব্যবসায়ীর হিসাবরক্ষক ছিলেন। রামানুজন শৈশব থেকেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তিনি ১৯০৩ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একই বছরে, তিনি ঘনক এবং দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় গণিত ছাড়া অন্য সব বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হন। পরে তিনি মাদ্রাজের একটি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু এখানেও গণিত ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে রামানুজনের ফল আশানুরূপ ছিল। এদিকে, বিবাহের পরে রামানুজনের দায়িত্বও বেড়ে যায়।

তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক সেশু আইয়ারের সুপারিশে তিনি নেলোরের তৎকালীন কালেক্টর আর. রামচন্দ্র রাওয়ের সঙ্গে দেখা করেন যিনি ভারতীয় গণিত সমিতির সভাপতিও ছিলেন। রামানুজনের নোটবুকটি দেখার পর আর রামচন্দ্র রাও রামানুজনের পারিশ্রমিক ২৫ টাকা ধার্য করেন। নোটবুকে রামানুজন সূত্র ও উপপাদ্য লিখেছিলেন এবং সেগুলো নিজেই প্রমাণ করেছিলেন এই সময়ে রামানুজন জার্নাল অফ দ্য ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির জন্য প্রশ্ন এবং তার সমাধান প্রস্তুত করার কাজ করেছিলেন। ১৯১১ সালে বার্নোলি সংখ্যার বিষয়ে উপস্থাপিত গবেষণাপত্রের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯১২ সালে আর. রামচন্দ্র রাও-এর সাহায্যে তিনি মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের অ্যাকাউন্টস বিভাগে কেরানি পদে চাকরি পান।

বিখ্যাত ইংরেজ গণিতবিদ অধ্যাপক জিএইচ হার্ডিকে একটি চিঠি লেখার পর তাঁর জীবন বদলে যায়। প্রথম দর্শনে হার্ডির কাছে এই চিঠিটি অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু যখন তিনি এটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করলেন, তখন তিনি দেখেন এই উপপাদ্যগুলোর অধিকাংশই তাঁর কল্পনার বাইরে।

হার্ডি ও তাঁর সহকর্মী জেই লিটলউড রামানুজের কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করেছিলেন। হার্ডি রামানুজনকে কেমব্রিজে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। রামানুজন সমুদ্রযাত্রার বিষয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন। এছাড়াও, তাঁর মা বিদেশ যাত্রার বিরোধিতা করেছিলেন। রামানুজন তাঁর মাকে রাজি করান এবং কেমব্রিজ যান। রামানুজন লিটলউড ও হার্ডির সঙ্গে কাজ শুরু করেন। ইতিমধ্যে তিনি হার্ডিকে ১২০টি উপপাদ্য পাঠিয়েছিলেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৬ সালের মার্চ মাসে রামানুজনকে তাঁর গাণিতিক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বিএ ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯১৫ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। ১৯১৭ সালের ৬ ডিসেম্বর তিনি লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। রামানুজন ১৯১৯ সালে জাতীয় বীর হিসেবে ভারতে ফিরে আসেন।

কর্মজীবন দ্রুত গতিতে ছুটলেও তাঁর শরীরে যক্ষ্মা বাসা বেঁধেছিল। তিনি ১৯২০ সালের ১২ জানুয়ারি হার্ডিকে শেষ চিঠি লিখেছিলেন, যেখানে তিনি মক থিটা কাজ সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। হার্ডি উত্তর দেওয়ার আগেই তিনি খবর পেয়েছিলেন যে রামানুজন আর নেই। তিনি ১৯২০ সালের ২৬ এপ্রিল মাত্র ৩২ বছর বয়সে মারা যান।

রামানুজনের সূত্রগুলো কতটা গভীর, আমরা এখনও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ জানতে পারিনি। সিগন্যাল প্রসেসিং থেকে শুরু করে কৃষ্ণ গহ্বর পর্যন্ত পদার্থ বিদ্যার বহু কাজে আজও তাঁর তথ্য ব্যবহৃত হচ্ছে। একুশ শতকে বিশ্ব বুঝতে পেরেছিল যে ব্ল্যাক হোল বোঝার জন্য মক থিটা ফাংশন প্রয়োজনীয়।

সূত্র: নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

বিজ্ঞপ্তি

‘শোক’– শিরোনামা সালাম আজাদের রবীন্দ্রজীবনভিত্তিক ধারাবাহিক রচনাটি *ভারত বিচিত্রায়* প্রকাশকালেই সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে আমাদের হাতে এসেছে। ফলে রচনাটির প্রকাশ অব্যাহত রাখার যৌক্তিকতা নেই, বিধায় বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি। সদাশয় পাঠক. আশাকরি, এ রসভঙ্গের দায় *ভারত বিচিত্রা* কর্তৃপক্ষের কাঁধে চাবাবেন না।
– সম্পাদক

বিশেষ ধারাবাহিক

শোক

সালাম আজাদ

[পূর্ব প্রকাশিত-র পর]

এই তিন ঘরের সামনে উঠান। দক্ষিণের ঘরের কিছুটা পেছনে রান্না ঘর ও আরও একটি উঠান। সব ঘরগুলোই চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দক্ষিণ ও উত্তরের ঘরের মাঝখানের পাঁচিলে সদর দরজা। এই সদর দরজার বাইরে উত্তরদিকে একটা বড় ঘর আর দক্ষিণ দিকে দারোয়ানদের থাকার ঘর। এরপরেই চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ফুল বাগান।

সে বাগানে অনেক দুর্লভ ফুলের গাছ লাগিয়েছেন অভয়াচরণ। পশ্চিম দিকে পুকুর। এই পুকুরের জলেই বাড়ির সকলের স্নান, পান, রান্না সব কাজ চলে। রবীন্দ্রনাথের জন্য পাত্রী দেখতে সবাই মিলে এ বাড়িতে ওঠলেও তারা শুধু নরেন্দ্রপুর গ্রামেই কন্যা সন্ধান করে ক্ষান্ত হননি। আশে পাশের গ্রামে যেমন দক্ষিণডিহি, চেঙ্গুটিয়া প্রভৃতি যেখানেই বিবাহযোগ্য মেয়ের খোঁজ পেতেন সেখানেই সন্ধান করতে যেতেন। কিন্তু পছন্দমত পাত্রী পাওয়া গেল না রবির জন্য। অবশেষে জোড়াসাঁকোর কাচারিবাড়ির একজন কর্মচারী বেণী রায়ের অপেক্ষাকৃত বয়স্কা কন্যা, নয় বছরের ভবতারিণীকে রবির পাত্রী হিসেবে স্থির করা হল।

ভবতারিণী দক্ষিণডিহির মেয়ে। রবির জন্য পাত্রী নির্বাচন করে তা মহর্ষিকে সবিস্তারে জানিয়ে দেয়া হল। পত্রপাঠ মহর্ষি রবিকে মুসৌরীতে ডেকে পাঠালেন। বিয়ের বিষয় নিয়ে তিনি পুত্র ও পাত্রের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে চান। যদিও পাত্রী সম্পর্কে কবির কোনও মতামত ছিল না। বউঠাকুরানীরাই মতামত দিয়েছিলেন।

যশোরে রবির জন্য পাত্রীর সন্ধানে গিয়ে বড় খাটুনী গেছে। কলকাতায় ফিরে নতুন বউঠাকুরানী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর এই অসুস্থতা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ডাক্তার ভাগ্যচন্দ্র রুদ্রকে বার বার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসতে হয়। প্রতিবারই তাকে চার টাকা করে ভিজিট দিতে হয়। কাদম্বরী দেবীর ঠিক কি অসুখ হয়েছিল তা পরিষ্কার করে বলা না গেলে যে-সব ঔষধ ব্যবহার করেছিলেন তার একটা বিবরণ: এলোপ্যাথিক ঔষধ, গায়ে মালিশ করার জন্য টার্পিন তেল, এনজ ফ্রুট সল্ট ইত্যাদি।

পিতৃদেবের ডাকে মুসৌরী পৌঁছার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের বিয়ের বাজার শুরু হয়। মহর্ষির কাছে বাড়ির কোনও বিষয়ই গোপন রাখার উপায় ছিল না। যদিও তিনি বেশির ভাগ সময় পাহাড়ে বসবাস করতেন। তিনি হয়তো অজ্ঞাত ছিলেন না, তার বিলাত ফেরৎ পুত্রের যে রুচি ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে, তাতে অজ পাড়াগাঁয়ের একটি বালিকাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে রবি সম্মত থাকবে কিনা। তাছাড়া বালিকার পিতা তাঁদেরই কাচারীর একজন কর্মচারী। কর্মকর্তা নয়। পিতৃদেবের কাছে প্রায় একমাস থাকার পরে কলকাতায় ফিরে আসেন রবি। পুত্রের সঙ্গে আলোচনায় সন্তুষ্ট হয়ে মহর্ষি রবির বিয়ের একটি দিন ধার্য করার নির্দেশ দেন।

মুসৌরী থেকে ফেরার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে রবি জ্যোতিদাদা ও নতুন বউঠানের সঙ্গে কর্ণাটকের প্রধান সমুদ্র বন্দর আইসিএস দাদার কর্মস্থল কারোয়া বেড়াতে যান। এই সমুদ্র বন্দরটি যে রবিকে মুগ্ধ করেছিল, তা উল্লেখ করতে তিনি কার্পন্য করেননি। এই করোয়ায় বসেই রবীন্দ্রনাথ ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ রচনা করেছিলেন।

কারোয়া থেকে ফেরার পর রবীন্দ্রনাথ নিজের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে নিজের বিয়ের নিমন্ত্রণ পাঠান এভাবে: ‘প্রিয়বাবু–/ আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে আমার পরম আত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ বিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬নং জোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন।’

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান হলেও তাঁর পরিবারে বিভিন্ন ধরনের হিন্দু প্রথা প্রচলিত ছিল। সে কারণেই রবীন্দ্রনাথের বিয়েতে গায়ে হলুদ, আইবুড়ো ভাত ইত্যাদি স্ত্রী-প্রথার আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের বিয়ের বিশেষত্ব হচ্ছে বাড়ির অন্য ছেলেদের মত বিয়ে করতে তিনি কন্যাপক্ষের বাড়িতে যাননি। তাঁর বিয়ে হয়েছিল মহর্ষি ভবনে, জোড়াসাঁকোতে। রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর বেণীমাধব রায় চৌধুরী কলকাতায় একটি বাড়ি ভাড়া করেছিলেন। বাড়িটি ভাড়া করে দেওয়া হয়েছিল মহর্ষির নির্দেশে এবং বাড়ি ভাড়াসহ অন্যান্য রাহা খরচ বাবদ যে ষাট টাকা খরচ হয়েছিল তা জোড়াসাঁকো এস্টেট থেকেই পরিশোধ করা হয়েছিল। সামাজিক অবস্থান ও বৈষম্যের কারণেই এ ভাড়াবাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়নি।

কবির বিয়ে হয়েছিল খুবই সাদামাটাভাবে। কবির বিয়ের সময় তাঁর মা সারদা দেবী পরলোকে। পিতা মহর্ষি মৌসুরিতে। রবীন্দ্রনাথের বিয়ের অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। নগেন্দ্র গুপ্ত ইংরেজিতে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার বাংলা সারমর্ম হচ্ছে: বাড়ির লোকজন ছাড়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন বন্ধু বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। পারিবারিক বেনারসী ও একটি শাল ছিল। বাড়ির ছেলেদের যার যখন বিয়ে হত এই শালটিই ছিল বর সজ্জার উপকরণ। রবীন্দ্রনাথ বর সজ্জার এই শালটি বিয়ের দিন পরেছিলেন। নিজের বাড়িতেই পশ্চিমের বারান্দা ঘুরে রবীন্দ্রনাথ বিয়ে

করতে এলেন অন্দর মহলে। স্ত্রী আচারের সব সরঞ্জাম সেখানে সাজানো। পিঁড়ির উপর এসে দাঁড়ালেন তিনি। কনে আনা হল, সাতপাক ঘুরানোর পর বর-কনে ভেতরের দালানে চললেন সম্প্রদান স্থলে।

বউ এলে রবীন্দ্রনাথ যে ঘরটিতে থাকবেন তা আগে থেকেই নির্দিষ্ট ছিল। সম্প্রদানের পর সেই ঘরে, বাসর ঘরে এসে বসলেন। বাসর ঘরে বসেই রবি দুষ্টুমি শুরু করলেন। ভাঁড়কুলো খেলা শুরু হলে, ভাঁড় খেলার বদলে ভাঁড়গুলো উপুড় করে দিতে লাগলেন ধরে ধরে। জীবনের সব কিছুই উল্টো-পাল্টা হয়ে যাচ্ছে রবির, তাই ভাঁড়গুলোও উল্টো-পাল্টা করে দিচ্ছেন। ভেতরের অনুভূতি প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসছে। গানও গাইতে শুরু করলেন তিনি। বিয়ের অনুষ্ঠানে জ্যোতিদাদা ও নতুন বউঠানের ভূমিকা কি ছিল, কোথায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গুরুসম এই দম্পত্তি? তবে বিয়ের রাতেই একটি বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটে, রবির বড় জামাইবাবু, সৌদামিনী দেবীর স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় শিলাইদহে আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেন। বাসী বিয়ের দিনে এই মৃত্যুর খবর জোড়াসাঁকোতে এসে পৌঁছে।

মুসোরি থেকে কাশি হয়ে মহর্ষি কলকাতায় ফিরে এসে নব দম্পতিকে চারটি মোহর দিয়ে আশীর্বাদ করেন। বিয়ের পর রবি স্ত্রীর নাম ভবতারিণী বদলে মৃণালিনী রাখেন।

বিয়ের পর এক মাসের কয়েকদিন বেশি– অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ক'টা দিন আর পৌষ মাসটি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ছিলেন। এত দীর্ঘ সময় মৃণালিনী দেবী আর কখনও জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসবাস করেননি। মাঘ মাসের শুরুতে তিনি জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে লোয়ার সার্কুলার রোডের (আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড) বাড়িতে চলে যান। মাঝে মধ্যে বেড়াতে এসেছেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। মৃণালিনী দেবীর পিতৃগ্রাম দক্ষিণডিহির একটি প্রাইমারি পাঠশালায় তার বিদ্যা শিক্ষার সূত্রপাত হলেও সমাপ্ত হয়নি, রবির উপযোগী করে তোলার দায়িত্ব পড়ে জ্ঞানদানন্দিনীর উপর। মৃণালিনীকে লরেটো স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। বালিকাবধূর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কি রকম দাঁড়িয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা শক্ত। তবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত রোমান্টিক মানুষের দাম্পত্য সম্পর্ক ক্রমেই মধুর হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রবীন্দ্রনাথের ঘরসংসার কেমন ছিল, সংসারের মধ্য থেকে সংসারী হয়ে কীভাবে তিনি দিন কাটাতেন, কবির সংসারচিত্রে যদি কেউ সুন্দর একটি সুবিন্যস্ত সাংসারিকতার রূপ দেখার আশা করেন তবে তাঁকে হয়তো নিরাশ হতে হবে।

সাংসারিক পরিপাটী ও শ্রীবৃদ্ধি বলতে সাধারণত যা বোঝায়, ঝাড়লণ্ঠন ঝোলানো বৈঠকখানা, বিলাতি আসবাবে সাজানো ড্রইংরুম, পত্নীর গা'ভরা গহনা, আলমারী ভরা বেনারসী, ঢাকাই জামদানী, রেশমী শাড়ি, বনিয়াদী ঘরের উপযোগী রূপার বাসন, ব্যাঙ্কে জমানো মোটা অংকের টাকা, ঘরের দেয়াল কেটে বসানো লোহার সিন্দুকে তাড়া বাঁধা কোম্পানির কাগজের স্তূপ– এর কোনওকিছুই কবির ছিল না কোনওদিনও। তেতলায় নিজের শোবার ঘরের পাশে খোপের মত ছোট একটি ঘর বানিয়ে কবি লিখতেন। পাশে সেই মাপেরই আর একটি ছোট ঘরে ছিল বসার ব্যবস্থা।

কৈশোরে কবি নিজের গায়ের আলোয়ান বেঁচে বই কিনেছেন শোনা যায়। সংসারী হয়ে নিজের সংসারটিকে নতুন আদর্শে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। কবির কন্যারা তৎকালীন প্রচলিত ধারায় লোরেটো-বেথুনে পড়েনি, পুত্র সেন্ট জেভিয়ার্স-প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হননি। নিজের আদর্শে কবি তাদের মানুষ করতে চেষ্টা করেছেন গোড়া থেকেই। কবির সৃষ্ট ভবিষ্যৎ আদর্শ শিক্ষালয়ের গোড়াপত্তন এদের নিয়েই।

প্রতিভার বরপুত্রদের প্রতিভার প্রভাব ছড়ায় ঘরে-বাইরে সর্বত্র। চলতি ভাবের সঙ্গে লড়াই বাধে তাঁদের পদে পদে। তাঁরা নতুন চোখে দেখেন, নতুন পথ সৃষ্টি করে চলেন, নতুন ভাবের কথাগুলো নতুন ছাঁদে বলেন বলে তাঁদের দৃষ্টিতে সেটি সহজ, সঙ্গত, স্বাভাবিক। সাধারণের দৃষ্টিতে সেটি অসহজ, অসঙ্গত, অস্বাভাবিক ঠেকে প্রথম প্রথম। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি।

কবিরা সাধারণত আদর্শের টানে চলেন। আদর্শ সৃষ্টির অনুরাগে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। তাঁদের ঘরসংসার পরিবার সেই আদর্শ অনুরাগের গতিমুখে পড়ে, সময়ে সময়ে কতকটা আবর্তিত না হয়ে পারে না। স্থিতিশীল সাংসারিকতা আদর্শবাদীর ধর্ম নয়।

বন্ধু স্থানীয় আত্মীয়দের পীড়াপীড়িতে একদিন মৃণালিনী দেবী দু'টি দুল ঝোলানো বিরবৌলি পড়েছিলেন। হঠাৎ কবি এসে পড়েন সেই সময় ঘরে, কবির প্রবেশমাত্র লজ্জা পেয়ে তিনি দুই কানে দুই হাত চাপা দেন। তিনি এত কম গহনা ব্যবহার করতেন যে দুটি বিরবৌলি কানে পরেই লজ্জা পেলেন। সমবয়সী বৌদের সাজতে বলতেন, কিন্তু নিজে সাজবেন না, এই ছিল তাঁর স্বভাব। 'বড় বড় ভাসুর পো ভাগ্নেরা চারদিকে ঘুরছে আমি আবার সাজবো কি' মৃণালিনী দেবীর নিজের মুখের কথা। কবি পিতার শেষ সন্তান, বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় ও সমবয়স্ক ভ্রাতষ্পুত্র ছিল তাঁর কয়েকজন।

মৃণালিনী দেবী কয়েকবার সাধ করে সোনার বোতাম গড়িয়েছিলেন কবির জন্মদিনে কবিকে পরাবেন বলে। কবি দেখে বললেন, ছি ছি ছি, পুরুষেরা কখনও সোনা পরে– লজ্জার কথা, তোমাদের চমৎকার রুচি। কবিপত্নী সে বোতাম ভেঙে ওপাল বসানো বোতাম গড়িয়ে দিলেন। দু'চারবার কবি সেটি ব্যবহার করেছিলেন যেন দায়ে পড়ে। কবির পছন্দ ছিল সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র। খাওয়া হত চমৎকার, কবিপত্নীর রান্নার ও মিষ্টান্নাদি প্রস্তুতের বিরাম ছিল না একদিনও। কবি প্রায়ই স্ত্রীকে বলতেন, 'নীচে বসে লিখতে লিখতে রোজ শুনি চাই ঘি, সুজি, চিনি, চিঁড়ে, ময়দা– মিষ্টি তৈরি হবে। যত চাচ্ছ তত পাচ্ছ, মহা যন্ত্রণা হয়েছে খুব।'

কবিপত্নীর রান্নার হাত ছিল চমৎকার। ব্যঞ্জনাদির স্বাদ ও মিষ্টান্নাদির পাক তাঁর হাতে উৎরাত উৎকৃষ্ট হয়ে। কবির জন্য প্রায়ই তিনি ঘরে নানা রকম মিষ্টান্ন তৈরি করতেন। চিঁড়ের পুলি, দইয়ের মালপো, পাকা আমের মিঠাই তার হাতের একবার যাঁরা খেয়েছেন, আর ভোলেননি। নাটরের ভূতপূর্ব মহারাজা স্বর্গীয় জগদীন্দ্রনাথ রায় কবিপত্নীর হাতের তৈরি দইয়ের মালপোয়ার ভূয়সী প্রশংসা করতেন।

নতুন নতুন রান্না আবিষ্কারের শখ কবিরও ছিল। বোধহয় পত্নীর কুশলতা এ সম্বন্ধে তার শখ বাড়িয়ে দিত বেশি। রন্ধনরতা পত্নীর পাশে মোড়া নিয়ে বসে নতুন রান্নার ফরমাশ করতেন কবি, শুধু ফরমাশ করেই ক্ষান্ত হতেন না, মালমসলা দিয়ে নতুন প্রণালীতে পত্নীকে নতুন রান্না শিখিয়ে কবি সখ মেটাতেন। শেষে তাকে রাগাবার জন্যে গৌরব করে বলতেন, 'দেখলে তোমাদের কাজ, তোমাদেরই কেমন একটা শিখিয়ে দিলুম।' তিনি চটে গিয়ে বলতেন 'তোমাদের সঙ্গে পারবে কে? জিতেই আছ সকল বিষয়ে।'

সংসারে এক উপদ্রব বাঁধাতেন কবি নিজের খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে, থেকে থেকে খাওয়া এত কমিয়ে ফেলতেন যে, কাছের লোক চিন্তিত না হয়ে থাকতে পারতো না। জন্ম থেকেই অটুট স্বাস্থ্য পাওয়ায় ও বয়সের জোর থাকায় শরীর তখন এইসব উপদ্রব সহ্য করেছে অনেকটা অনায়াসে। ঘরের লোকের ধারণা, খেয়ালের বশে কবি স্বল্পহারে শরীর নষ্ট করছেন। কাজেই এই ব্যাপারে তাঁরা উপদ্রব বলেই গণ্য করতেন। কবি যে শরীরের খাদ্য না খুঁজে মনের উপযোগী খাদ্য খুঁজে নিচ্ছেন একথা বোঝা যেত না তখন স্পষ্ট করে। ঘরের মানুষ যাঁদের লক্ষ্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি, তাঁরা এমনতর লোক নিয়ে বেগ পেতেন সর্বদা। স্বল্পাহারের বাড়াবাড়ি দেখে কেউ কবিপত্নীকে স্বাস্থ্যপ্রদ কিছু খাদ্য কবিকে খাওয়ানোর কথা বললে কবিপত্নী বলতেন, 'তোমরা চেনো না, বললে জেদ আরও বাড়বে; না খেয়ে দুর্বল হয়ে সিঁড়ি উঠতে মাথা ঘুরে পড়ুন আগে, তারপর নিজেই শিখবেন কারো শেখানো কথা শুনবার ধাতের মানুষ নন।'

কবি বহু বৎসর নিরামিষভোজী ছিলেন। পত্নীবিয়োগের পর ঘরে যখন কবি নিরামিষভোজী, এমন কি সময়ে সময়ে অন্ন ত্যাগ করে ছোলা ভিজানো, মুগডাল ভিজানো খেয়ে দিন কাটান তখন কর্মসূত্রে মাঝে মাঝে পতিসরে যেতে হত। কবির শাশুড়ী তখন নিজ গ্রাম যশোহর জেলার ফুলতলাস্থ দক্ষিণডিহি ছেড়ে জামাতার কর্মস্থান পতিসরে বাস করতেন। তিনি স্বহস্তে ব্যঞ্জনাদি রান্না করে জামাতার পাতে দিলে কবি 'না' বলতেন না। কন্যা নেই, পাছে তিনি মনে কষ্ট পান ভেবে নিজের ইচ্ছা সেখানে কবি খর্ব করতেন। সঙ্গে ভৃত্য উমাচরণ ফিরে এসে গল্প করত, 'এখানে বাবু মশায় খাওয়া নিয়ে এত গোলমাল করেন, পতিসরে কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুণ যা দেন তাই খান, একটি কথা বলেন না, শাশুড়ী কিনা।' ভৃত্যরা খুশী মনে সহজভাবে কবির সামনে কথা বলে, কবি সেটা ভালবাসতেন চিরদিন। ভয় পেয়ে ভৃত্য কাজ করবে, তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না।

শান্তিনিকেতনে একদিন বিকালে চায়ের টেবিলে কবি বসেছেন। ঘরে

ভাল মিষ্টি কবির জন্য তৈরি করা হোক জনৈক আত্মীয়া একথা বলায় কবি হঠাৎ বলে ফেললেন, 'ঘরের-মিষ্টি আর আমার দরকার নাই।' স্ত্রীর কথা মনে পড়ায় তাঁকে ব্যথা দিল। অন্তরের ব্যথা খুব চেপে রাখতেন কবি, কেমন করে সেদিন কথাটুকু মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়েছিল।

উপকরণের বোঝা বয়ে চলা সম্বন্ধে কবির মনে গভীর বিরাগ ছিল গোড়া থেকে। মনের চেতনা যাঁদের সূক্ষ্ম উপকরণের ভার তাঁরা সইতে পারেন না, দুঃখ পান তাই নিয়ে। ঘরছাড়া কবি ঘর ছেড়ে অন্যত্র বাসা বাঁধতে গেছেন কয়েকবার। যাত্রাকালে কবির মুখে এককথা, উপকরণ আবর্জনা ফেলে যাও, ওদের সঙ্গের সাথী করো না। ঘর সংসারে প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিস বঁটি, কাটারি, কুরুণী, বারকোষ, কড়া, খুন্তি হাতের বোঝাটি সঙ্গে যাচ্ছে দেখলেই কবি হুলুস্থুল বাধাতেন। চটে গিয়ে বলতেন 'এসব জঞ্জাল জড়ো কোরো কেন' যেন দু'খানি বস্ত্র হাতে নিয়ে বেরোতে পারলেই ভাল হয় কবির।

পথযাত্রায় গৃহস্থালী সরঞ্জাম দু'একটি বেশি সঙ্গে নেওয়ার দিকে মেয়েদের ঝোঁক, পুরুষদের দৃষ্টিতে সেগুলো অনাবশ্যক ঠেকে। বোঝা বাড়াও কেন, পুরুষদের কথা। সময়কালে অভাবে ঠেকতে না হয়, মেয়েদের ভাব। প্রায় সকল বাড়ীর মেয়েই যাত্রাকালে পুরুষদের লুকিয়ে ব্যবহার্য দু'একটি জিনিস সঙ্গে নিয়ে থাকেন। কবির সংসারেও তার ব্যতিক্রম হত না, কবি পত্নীও কতগুলো সরঞ্জাম সঙ্গে নিতেন লুকিয়ে। মৃণালিনী দেবী বলতেন, 'দেখ তো বাপু, এমন লোক নিয়ে কি করে ঘর করা যায়। ফেলে তো যাব সব, এদিকে গিয়েই কিন্তু অতিথি সমাগমের ধুম পড়ে যাবে। তখন আনো মালপো, আনো মিঠাই, ভাজো সিঙ্গারা, ভাজো নিমকী, কুচুরী, তাও আবার কম হলে চলবে না, পাত্র বোঝাই প্রচুর হওয়া চাই। সরঞ্জাম না হলে জিনিস আসবে কোথা থেকে সে কথা বলে কে।'

কবি আদর্শের টানে নানা সময়ে নানা ভাবে নিজেকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলতে মনে কোন দ্বিধা রাখতেন না। আদর্শ প্রবণতা তাঁকে কোথায় কখন কোন্ সংকটে জড়িয়ে ফেলে এ ভাবনা কবি পত্নীর মনে থাকতো। কবি ও কবির পরিবার অভিন্ন, কবি বিপন্ন হলে পরিবারটিরও বিপন্ন হওয়া স্বাভাবিক।

কবির মুখে 'ফেলো ফেলো ছাড়ো ছাড়ো' শুনে কবিপত্নী বলতেন, 'ঘরকন্না ফেঁদে, সন্তান সন্ততি নিয়ে সংসার করতে গেলে এক কথায় ফকির সাজা চলে না।' পতি পত্নীর মধ্যে হৃদয়ের ব্যবধান থাকা সম্ভব নয়। একের ভাবে অন্যের যুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কবির ভাবে কবি পত্নী অনুপ্রাণিত না হয়ে পারেননি।

পিতৃবিয়োগের পর কবি পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হন। সম্পত্তি অধিকারের অল্প কয়েক বৎসর পরেই সমস্ত সম্পত্তি দানপত্রে লেখাপড়া করে ছেলেদের নামে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। দলিলাদি তৈরির আদেশ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। কবির জনৈক নিকটাত্মীয় পরামর্শ দেন, ছেলেরা এখনও ছোট, এখনই একাজ করা সংগত হবে না ইত্যাদি অনেক কারণ দেখিয়ে তখনকার মত কবিকে সে কাজ হতে নিরস্ত করেন। বিষয়ের বোঝা নামাবার একান্ত আগ্রহ। নিজের সমস্ত বাংলা পুস্তকের কপি রাইট বিক্রি করে শান্তিনিকেতন আশ্রমের একাধারে বিভাগ গড়ে তোলার জন্যও কবি সে সময় অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সেই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে কন্যা রাজবাড়ী যাবে– নিতান্ত সাধারণ বেশে কবি পাঠিয়েছেন তাকে সেখানে। আত্মীয়রা বলছেন, এমন সাজে কবি রাজবাড়ী কন্যা পাঠান যে দেখে লজ্জা করে। কবির উত্তর, 'এই বেশে কন্যা আমার স্নেহ সম্মান যদি না পায় তবে তেমন সম্মানে কাজ নেই। বেশভূষা যে সম্মানের যোগ্যতা প্রমাণ করে সে সম্মান না পাওয়াই শ্রেয়।'

শিক্ষাব্রতী কবি আদর্শ শিক্ষালয় গঠনে যখন প্রবৃত্ত, কবির সহধর্মিনী তখন সহকর্মী হয়েছিলেন সে কাজে। ছাত্রদের জলখাবার তৈরির ভার নিয়েছিলেন নিজের হাতে, স্নেহ দিয়ে গড়তে চেয়েছিলেন ছাত্রগুলোকে। বিদ্যালয় আরম্ভের একটি বৎসর শেষ না হতেই বিদ্যালয়ের জননী কবি পত্নীর আয়ু শেষ হয়ে যায়। কবির সংসার ভেঙে দিয়ে চলে গেলেন অকালে। মৃত্যুশয্যায় কবি নিজের হাতে তাঁর যে শুশ্রূষা করেছেন তা ঠাকুর পরিবারে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়। প্রায় দু'মাস মৃণালিনী দেবী শয্যাশায়ী ছিলেন, ভাড়া করা নার্সদের হাতে স্ত্রী শুশ্রূষার ভার কবি একদিনের জন্যও দেননি।

ছেলেদের সবসময় যত্নে ও সাবধানে রাখার পক্ষে তাঁর বিদ্যালয়ই উপযুক্ত স্থান, কবি বুঝেছিলেন। মৃত্যুর ছায়া তাদের মনে ঘনিয়ে আসবে সেটা যেন কবি সইতে পারছিলেন না। সন্তান স্নেহ ছিল কবির অপরিমেয়। প্রথম সন্তান, কন্যাটিকে পিতা হয়েও তিনি মাতৃস্নেহে পালন করেছিলেন ধাত্রীরূপে। শিশুকে দুধ খাওয়ানো, কাপড় পরানো, বিছানা বদলানো কবি সব করতেন নিজের হাতে।

১৩০৯ সালের ৭ অগ্রহায়ণ: নভেম্বর ২৩, ১৯০২, রবিবার শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঠিক ১১ মাস পরে, মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে কবি পত্নী পরলোকগমন করেন। সেদিন কবি একলা ছাদে চলে যান, বারণ করেছিলেন কাউকে কাছে যেতে। প্রায় সারারাত কবি ছাদে পায়চারী করে কাটিয়েছেন। কবির পিতা মহর্ষি তখন জীবিত। পুত্রের পত্নীবিয়োগের সংবাদে তিনি বলেছিলেন, 'রবির জন্য আমি চিন্তা করি না, লেখাপড়া, নিজের রচনা নিয়ে সে দিন কাটাতে পারবে। ছোট ছেলেমেয়েগুলির জন্যই দুঃখ হয়।' কবি পত্নী মৃণালিনী দেবী শ্বশুর-স্বামী, পুত্র-কন্যা, পরিবেষ্টিত সাজানো সংসার ফেলে গেলেন, কবির সংসার গেল ভেঙে, সেই থেকে নিজের ভাঙা সংসার টেনে নিয়ে চলেছেন আমৃত্যু।

অসংখ্য ভাঙাচোরার বোঝা বুকে নিয়ে কবির সেই ভাঙ্গা সংসার বিশ্বভারতীর বিরাট পর্বে পরিসমাপ্ত।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বোন অমলা দাশকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায় সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি এতদিন আমাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু যখনই আমি কোন একটা সমস্যায় পড়ি সেটা একা মীমাংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখনই আমি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি। কথিত আছে মৃণালিনীর মত নিয়েই পুত্রকে প্রতিমা দেবীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। প্ল্যানচেটে স্ত্রীকে ডেকে এনে কবি স্ত্রীর সম্মতি পেয়েছিলেন।

প্রতিমা বিনয়নী দেবীর কন্যা। তাঁর প্রথম স্বামী নীলনাথের অকাল মৃত্যুর পর, রবীন্দ্রনাথ সমাজসংস্কার অগ্রাহ্য করে ছেলে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবাহ দেন। ঠাকুর পরিবারে এটিই প্রথম বিধবা বিবাহ। প্রতিমা দেবী কেবল সুন্দরী ছিলেন না, লেখিকা, কবি, চিত্রশিল্পী ও নৃত্যবিশারদ হিসেবেও প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। 'কল্পিতা দেবী' ছদ্মনামে প্রবাসী পত্রিকায় তিনি লিখেছেনও। কল্পিতা নাম রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া। কবির আগ্রহে শান্তিনিকেতনে নারীশিক্ষা ও সমাজকল্যাণ বিষয়ে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। 'আলাপিনী' সমিতি গঠন করে মহিলাদের আত্মোন্নতিতে তিনি যত্নবান হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিমা দেবী বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। বস্তুত বিবাহের পর থেকেই বাবা মশায়ের দেখাশোনার সর্ববিধ দায়িত্ব তিনিই সামলেছেন। তাঁর রচনা 'স্মৃতিচিত্র' ও নির্বাণ' অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর অসহায় কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'স্ত্রী বিদায়ের পর আমার আর কেউ নেই, যাকে সব কথা খুলে বলা যায়।'

•

সালাম আজাদ

ঔপন্যাসিক গল্পলেখক প্রবন্ধকার কবি রাজনীতিক সমাজসেবক সালাম আজাদের জন্ম বিক্রমপুরের দামলা গ্রামে ১৯৬৪ সালের ১০ জুলাই। পিতা আবদুর রাজ্জাক ও মাতা জসিমন নেসা উভয়েই পরলোকে। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫৭। সালামের লেখার বিষয়বস্তু মূলত মুক্তিযুদ্ধ, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য। তাঁর বেশ কয়েকটি বই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাস 'কল্পনা চাকমা' ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সালাম আজাদের লেখার অনুপ্রেরণার উৎস তাঁর স্ত্রী মির্জা ফাহমিদা আজিম ওরফে সহেলী মির্জা দীর্ঘ দেড়বছর ক্যান্সারের সঙ্গে যুদ্ধ করে ২০১৪ সালে পরলোকগমন করেন। স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতিষ্ঠা করেন 'সহেলী মির্জা ক্যান্সার ফাউন্ডেশন'।

চলচ্চিত্র/১

সুচিত্রা সেন

বাঙালির স্বপ্নের মহানায়িকা

(জন্ম ৬ এপ্রিল, ১৯৩১ ॥ মৃত্যু ১৭ জানুয়ারি, ২০১৪)

রমা দাশগুপ্ত ছিল তাঁর পারিবারিক নাম। ১৯৬৩ সালে সাত পাকে বাঁধা চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে সুচিত্রা সেন 'সিলভার প্রাইজ ফর বেস্ট অ্যাকট্রেস' জয় করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় অভিনেত্রী যিনি কোনও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মান প্রদান করে। শোনা যায়, ২০০৫ সালে তাঁকে 'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার' দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল; কিন্তু সুচিত্রা সেন জনসমক্ষে আসতে চান না বলে এই পুরস্কার গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। ২০১২ সালে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সর্বোচ্চ সম্মাননা বঙ্গবিভূষণ প্রদান করা হয়।

ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রেসিডেন্সির (অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার অন্তর্গত সেন ভাঙাবাড়ি গ্রামে সুচিত্রা সেনের জন্ম) পাবনা জেলার সদর পাবনায় সুচিত্রা সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা করুণাময় দাশগুপ্ত ছিলেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও মা ইন্দিরা দেবী ছিলেন গৃহবধূ। তিনি ছিলেন পরিবারের পঞ্চম সন্তান ও তৃতীয় কন্যা। পাবনা শহরেই তিনি পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন কবি রজনীকান্ত সেনের নাতনী।

১৯৪৭ সালে বিশিষ্ট শিল্পপতি আদিনাথ সেনের পুত্র দিবানাথ সেনের সঙ্গে সুচিত্রা সেনের বিয়ে হয়। তাঁদের একমাত্র কন্যা মুনমুন সেনও একজন খ্যাতনামা অভিনেত্রী। ১৯৫২ সালে সুচিত্রা সেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত হন।

চলচ্চিত্র জীবন

১৯৫২ সালে 'শেষ কোথায়' ছবির মাধ্যমে তার চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু হয় কিন্তু ছবিটি মুক্তি পায়নি। উত্তমকুমারের বিপরীতে 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে তিনি অভিনয় করেন। ছবিটি বক্স-অফিসে সাফল্য লাভ করে এবং উত্তম-সুচিত্রা জুটি উপহারের কারণে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলা ছবির এই অবিসংবাদিত জুটি পরবর্তী ২০ বছরে ছিলেন বাংলা সিনেমার আইকন।

সম্মাননা

১৯৫৫ সালের দেবদাস ছবির জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কারলাভ করেন, যা ছিল তাঁর প্রথম হিন্দি ছবি। উত্তমকুমারের সাথে বাংলা ছবিতে রোমান্টিকতা সৃষ্টি করার জন্য তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বিখ্যাত অভিনেত্রী। ১৯৬০ ও ১৯৭০ দশকে তাঁর অভিনীত ছবি মুক্তি পেয়েছে। স্বামী মারা যাওয়ার পরও তিনি অভিনয় চালিয়ে গেছেন, যেমন হিন্দি ছবি 'আঁধি'। এই চলচ্চিত্রে তিনি একজন জননেত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। বলা হয় যে, চরিত্রটির প্রেরণা এসেছে ইন্দিরা গান্ধী থেকে। এই ছবির জন্য তিনি ফিল্মফেয়ার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছিলেন এবং তাঁর স্বামী চরিত্রে অভিনয় করা সঞ্জীবকুমার শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার জিতেছিলেন। হিন্দি চলচ্চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিবছর যে দাদাসাহেব সম্মাননা প্রদান করে ভারত সরকার, চলচ্চিত্রের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সে সম্মাননা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন সুচিত্রা সেন। ২০০৫ সালে দাদাসাহেব সম্মাননা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি। সম্মাননা নিতে কলকাতা থেকে দিল্লি যেতে চাননি বলেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

১৯৫৪ সালে সুচিত্রা সেনকে অভিনয় ছাড়তে বলেছিলেন স্বামী দিবানাথ সেন। কারণ উত্তমকুমারের সঙ্গে রোমাঞ্চের সম্পর্ক। আসলেই কি উত্তম-সুচিত্রা জুটির মধ্যে ব্যক্তি রসায়ন ছিল। এ ধোঁয়াশা ঘেরা প্রশ্নের উত্তর এখনও খুঁজে ফেরেন ভক্তরা। ১৯৫৩ সালে এই জুটির প্রথম ছবি 'সাড়ে চুয়াত্তর' মুক্তি পেয়ে হিট হয়। প্রথম ছবিতেই দর্শক তাদের পর্দার মত বাস্তব জীবনেও প্রেমিকযুগল ভাবতে থাকে। এই ভাবনা জোরালো হয় ১৯৫৪ সালে। ওই বছর মুক্তি পায় তাদের ছয়টি ছবি। প্রতিটি ছবিতেই জীবনঘনিষ্ঠ অভিনয়ের কারণে দর্শকের মনে উত্তম-সুচিত্রার প্রেমের কল্পকথা জোরালো হতে থাকে। তবে দর্শকের অন্ধবিশ্বাসের আগুনে ঘৃতাহুতি দেন সুচিত্রা নিজেই। ওই বছর মুক্তি পায় 'অগ্নি পরীক্ষা'। এ ছবির পোস্টারে লেখা ছিল 'আমাদের প্রণয়ের সাক্ষী হল অগ্নিপরীক্ষা'। এ লেখার নিচে ছিল সুচিত্রার স্বাক্ষর। এই পোস্টার দেখে অঝোরে কেঁদেছিলেন উত্তম কুমারের স্ত্রী গৌরী দেবী। অন্যদিকে এর আঁচ ছড়িয়েছিল সুচিত্রার দাম্পত্য জীবনেও। উত্তম-দিবানাথের সম্পর্কের অবনতি এখান থেকেই শুরু। স্বামীর জোরালো সন্দেহের কারণে ওই বছর চুক্তিবদ্ধ হওয়া আরও চারটি ছবিতে কাজ করতে পারেননি সুচিত্রা। স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও অভিনয় ছাড়তে রাজি হননি মহানায়িকা। সুচিত্রা সেনকে চিত্রজগতের সবাই মিসেস সেন বলে ডাকতেন। কিন্তু উত্তমকুমার ডাকতেন রমা নামে।

আর উত্তমকুমারকে রমা ডাকতেন 'উতো' বলে। দাম্পত্য কলহ বাড়তে থাকায় মেয়ে মুনমুনকে সুচিত্রা পাঠিয়ে দেন দার্জিলিংয়ে কনভেন্টে পড়তে। ১৯৫৭ সালে উত্তমকুমার 'হারানো সুর' প্রযোজনা করলেন। নায়িকা হতে বললেন সুচিত্রা সেনকে। উত্তম প্রযোজনা করছেন শুনে সুচিত্রা সেন বললেন, 'তোমার জন্য সব ছবির ডেট ক্যান্সেল করব।' হলও তাই। এতে আরও ক্ষেপলেন দিবানাথ।

নকশাল হামলা থেকে 'মবিং'। পরিস্থিতি যতই দুরূহ হোক, সুচিত্রা সেন সামলে দিতেন অবলীলায়। মহানায়িকার সেই দাপট দিনের পর দিন খুব কাছ থেকে দেখেছেন অমল শূর। অসিত সেনের সঙ্গে পাঁচটা ছবিতে ('উত্তর ফালগুনী', 'আলো আমার আলো', 'মমতা' (হিন্দি) 'কমললতা', 'মেঘ কালো') অ্যাসিস্ট করতে গিয়েই আলাপ। মৃত্যুর আগে এক শুক্রবারের দুঃখী দুপুরে সেই সব না-বলা গল্পের ঝাঁপি খুলে বসেন মহানায়িকা শতরূপা বসু-র সামনে, 'আমায় যেন চিতায় দাহ করা হয়। চুল্লিতে আমি যাব না। আমি ধোঁয়া হয়ে আকাশে উড়ে যাব, ছাই হয়ে মাটিতে মিশে যাব', এটাই শেষ ইচ্ছে ছিল সুচিত্রা সেনের। অমল শূর বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম বেলুড় মঠে হবে শেষকৃত্য। যাক গে... ১৯৬২ থেকে ম্যাডামের সঙ্গে আমার পরিচয় (ওঁকে এই নামেই ডাকতাম আমি)।

আপনাদের বিপ্লব কি সুচিত্রা সেনকে নিয়ে?

অমল শূরের স্মৃতিচারণ: 'আলো আমার আলো'র শ্যুটিংয়ের একটা ঘটনা। তখন নকশাল আমল। এনটি ওয়ান থিয়েটার্সে চলছিল শ্যুট। নিজের মেক-আপ রুমে বসে তৈরি হচ্ছিলেন ম্যাডাম। হাতে 'আলো আমার আলো'র চিত্রনাট্য। ম্যাডাম কোনওদিনই সংলাপ মুখস্ত বলতেন না। চিত্রনাট্যটা পড়তেন ভালো করে। একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল ওঁর রিয়্যাকশন। সেটাই করছিলেন। এমন সময়, ওঁর ঘরে ঢুকে পড়ে তিনটি ছেলে। সেই সময় যারা নকশাল করত তাদের অনেককেই আমরা চিনতাম। তাদের মধ্যে প্রধান ছিল রঞ্জিত নামে একটি ছেলে। হঠাৎ কানে এল, চিল চিৎকার, 'গেট আউট, গেট আউট!' হুড়মুড়িয়ে এসে দেখি ম্যাডাম চিৎকার করে ছেলেগুলিকে বকছেন। 'কোন সাহসে আপনারা আমার ঘরে পারমিশান ছাড়া ঢুকেছেন?' ছেলেগুলোও তেমনি, কিছুতেই যাবে না। অবশেষে, 'বেশ করেছি... দেখে নেব' বলে-টলে চলে গেল। স্টুডিয়োর গেট বন্ধ করে দেওয়া হল। স্টুডিয়ো মালিককে বলে লালবাজারে পুলিশে খবর দিয়ে ম্যাডাম নিজের প্রটেকশনের ব্যবস্থা নিজেই করলেন।

সেদিনের শ্যুটিং শেষ হল। ততক্ষণে প্রায় ৫০০ ছেলে জড়ো হয়েছে গেটের বাইরে। গেটের ভেতরে ম্যাডামের গাড়ি দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার ছিল না। উনি গিয়ে হর্নটা চেপে ধরলেন। ঝাঁ-ঝাঁ হর্ন বাজছে। ড্রাইভার দৌড়ে এল। ম্যাডাম সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসে, আমি পিছনে। তারপর, সবাই বারণ করা সত্ত্বেও, গেট খোলার নির্দেশ দিলেন। ৫০০ ছেলে হামলে পড়ল গাড়ির উপর। উনি আস্তে আস্তে গাড়ির কাচ নামালেন। তারপর দরজা খুললেন। সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, 'আপনি আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে।'

ম্যাডাম আরও কঠিন হয়ে গেলেন। বললেন, 'কে আপনারা? স্টুডিয়ো আমার প্রফেশনাল জায়গা। আমার পারমিশন না নিয়ে ঢুকেছিলেন বলেই আমি আপনাদের বারণ করি। ক্ষমা তো আমি চাইব না। আপনারা বলুন কি চান?' ওরা বলল, 'আমরা বিপ্লবী'। ম্যাডাম বললেন, 'আপনাদের বিপ্লব কি সুচিত্রা সেনকে নিয়ে? যদি আপনাদের কোনও সাহায্য লাগে আমি করতে পারি। কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই নেই। আমি এখানে গাড়িতে বসে রইলাম। আপনাদের যা খুশি করতে পারেন।'

এরপর, ছেলেরা ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত ওদের নেতা বলে, 'দিদি আমাদের ক্ষমা করবেন।' মনে হল যেন ৫০০টা ছেলে একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। এমনই সাহস আর ব্যক্তিত্ব ছিল ম্যাডামের। নিজে ঝামেলার মুখোমুখি হতেন। আর কারও, এমনকি উত্তমকুমারেরও এরকম পাবলিক হ্যান্ডেল করবার সাহস আর ক্ষমতা দেখিনি।

আরেকবার, অষ্টমীর দিন সন্ধেবেলা, আমরা গাড়ি করে বেরিয়েছি। ব্রাবোর্ন রোড থেকে লিটন স্ট্রিট-এর দিকে যাচ্ছি। ভিড়ের জন্য গাড়ি এগোচ্ছে খুব ধীরে। এমন সময় একটি মেয়ে, সেও খুবই সুন্দরী, দূর থেকে ম্যাডামকে দেখে। চোখাচোখি হয় দু'জনের। অন্য ফ্যানেদের মত মেয়েটি কিন্তু দৌড়ে না এসে ম্যাডামকে একটা ফ্লাইয়িং কিস ছুঁড়ে দেয়। উত্তরে ম্যাডাম হাত মুঠো করে সেটি নিয়ে, নিজের সারা মুখে মেখে, ওর দিকে পাল্টা কিস ছুঁড়ে দেন। এমনই ছিল তাঁর মেজাজ। মেয়েটি যে তাঁর দিকে ছুটে আসেনি সেটা খুব পছন্দ হয়েছিল ম্যাডামের। গাড়ি ছেড়ে দেয়।

একবার উত্তমকুমার 'সন্ন্যাসী রাজা'র প্রযোজক অসীম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন। লোক জমায়েত হওয়ার ফলে ঝামেলার সম্মুখীন হন। তারপর পুলিশ আসাতে সে-যাত্রায় বেঁচে যান। ম্যাডামের মত নিজে ঝামেলার মুখোমুখি কিন্তু হননি।

নকশাল পিরিয়ডে, ঝামেলার জন্য প্রায়ই ম্যাডামের বাড়ির গেস্ট-রুমে থেকে যেতাম। ম্যাডামই বাড়ি ফিরতে বারণ করতেন। বিশাল বাড়ি। একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের টেনিস লন ছিল সেখানে। পোর্টিকো পেরিয়ে, বিরাট লিভিং রুম, 'এল'-শেপের শ্বেতপাথরের বারান্দা পেরিয়ে ওঁর ঘর। মাঝখানে মুনমুনের ঘর। আর একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে গেস্ট-রুম। আমি একবার বলেছিলাম, 'আমি আপনার থেকে অনেক ছোট। আমাকে 'আপনি' বলেন কেন?' বলেছিলেন, 'তুই' আমার অন্তরে। বাইরে, 'আপনি'। আমি যদি সর্বসমক্ষে 'তুই' করে বলি তাহলে লোকে আপনাকে আমার চামচা বলবে। সম্মান করবে না। তাই, 'আপনি'ই থাক।'

বাড়িতে জাপানি কাফতান পরতেন। একবার ওঁর বাড়িতে থেকে গিয়েছি। আমাকে একটা কড়কড়ে নতুন শাড়ি দিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, 'এটা পরে শুয়ে পড়ুন। আমাকেই পাওয়া হবে।' আজ এই কথাগুলো বলতে বলতে গলা বুজে আসছে। সবার একটা ধারণা ছিল, সারাদিন সুচিত্রা সেন পুজোর ঘরে কাটাতেন। এটার কারণটা কী জানেন? ওঁর পুজোর ঘরে একটা বড় কাঠের সিংহাসন ছিল। তার ওপর প্রচুর বিগ্রহ। রূপোর রাধা-কৃষ্ণ থেকে শুরু করে আরও অনেক। এই সিংহাসন রোজ ফুল দিয়ে সাজাতেই ওঁর প্রায় ঘণ্টাদেড়েক লাগত। এটা করতে গিয়েই আসলে সময়টা যেত।

উত্তমকুমারের সঙ্গে ওঁর কোনও রোম্যান্টিক সম্পর্ক ছিল না। বলেছিলেন, 'আমি উত্তমের গলা ধরে ঝুলতে পারি। তাতে আমার বা উত্তমেরও কোনও 'সেনসেশন' হবে না। যেটা আমার ক্ষেত্রে অন্য পুরুষের সঙ্গে হতে পারে।' একবার একটা ঘটনা দেখেছিলাম। ম্যাডামের বাড়ি ঢুকছি, দেখি উত্তম ম্লানমুখে বসে আছেন। চলে যাওয়ার পর জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেছিলেন, কোনও এক সমস্যা নিয়ে উত্তম এসেছিলেন তাঁর কাছে। কী সমস্যা সেটা অবশ্য ম্যাডাম আমাকে বলেননি। তবে, উত্তম নাকি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমাদের বিয়ে হলে কেমন হত?' ম্যাডাম তার উত্তরে বলেছিলেন, 'একদিনও সেই বিয়ে টিঁকত না। তোমার আর আমার ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত স্বতন্ত্র। আর খুব স্ট্রং। সেখানে সংঘাত হতই। তার ওপর, তুমি চাইবে তোমার সাফল্য, আমি চাইব আমার। এ রকম দু'জন বিয়ে করলে সে বিয়ে খুব বাজেভাবে ভেঙে যেত।'

সংকলন: পরমা

চলচ্চিত্র/২

ভারত এখন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র নির্মাণের কেন্দ্র

২০২১ সালের নভেম্বর মাসে ভারত ৫২তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে। উৎসবে আঞ্চলিক ভাষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে ভারত এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সরকারের লক্ষ্য হল প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতের যুব সম্প্রদায়ের প্রতিভার সদ্ব্যবহার করে ভারতকে চলচ্চিত্র উৎসব এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ পরবর্তী কাজের কেন্দ্রে পরিণত করা। ভারত যেন আগামী দিনে কাহিনি নির্মাতাদের সবচেয়ে পছন্দের স্থান হয়ে ওঠে, সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে দেশ। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলছে আইএফএফআই।

২০ থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত গোয়ায় অনুষ্ঠিত ৫২তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (আইএফএফআই) ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো প্রথমবার সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। আইএফএফআইয়ের ইতিহাসে এই প্রথমবার নেটফ্লিক্স, আমাজন ও সোনির মত সমস্ত প্রধান ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো বিশেষ মাস্টারক্লাস, বিষয়বস্তু লঞ্চ, প্রিভিউ, কিউরেটেড ফিল্ম প্যাকেজ স্ক্রিনিং এবং অন্যান্য অন-গ্রাউন্ড এবং ভার্চুয়াল উপস্থাপনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে। চলচ্চিত্র উৎসবে ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ আগামী দিনে এই অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠতে চলেছে। আইএফএফআই নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে, দর্শকদের সিনেমা দেখার জন্য একাধিক প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে, যুগের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলছে এবং ব্রিকস দেশগুলো থেকে আগত সেরা চলচ্চিত্রগুলোও প্রদর্শন করে।

৫২তম আইএফএফআই ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের বহু কিংবদন্তীকে স্বাগত জানিয়েছে। স্যার শন কনারি যিনি জেমস বন্ড চরিত্রটিকে রূপালী পর্দায় জীবন্ত করে তুলেছিলেন, তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। আইএফএফআই ভারতের ৩৫ বছরের কম বয়সি ৭৫ জন সৃজনশীল তরুণ প্রতিভাকে একটি উল্লেখযোগ্য মঞ্চ প্রদান করে। অনুষ্ঠানচলাকালীন, এই ৭৫জন সৃজনশীল প্রতিভা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সুযোগ পান এবং উৎসবে আয়োজিত মাস্টারক্লাসে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উৎসবে এই প্রথমবার ব্রিকস চলচ্চিত্র উৎসবের মাধ্যমে পাঁচটি ব্রিকস দেশের চলচ্চিত্রও প্রদর্শিত হয়। এই পাঁচটি দেশ হল ব্রাজিল, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, চিন ও ভারত। ৫২তম আইএফএফআইয়ে বিশেষ নজর ছিল এই দেশগুলোর উপর। ভবিষ্যতের ৭৫জন সৃজনশীল শিল্পীকে উৎসাহ প্রদান '৭৫ ক্রিয়েটিভ মাইন্ডস অফ টুমরো' উদ্যোগের মাধ্যমে ভবিষ্যতের ৭৫জন সৃজনশীল শিল্পীকে আইএফএফআইয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে, এই শিল্পীদের একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাঁদের প্রতিভা উপস্থাপন করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। এই তরুণ প্রতিভাদের খুঁজে আনা ও বিকাশের লক্ষ্যে একটি অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, ভবিষ্যতের ৭৫জন প্রতিশ্রুতিমান সৃজনশীল শিল্পীকে বেছে নেয়া হয়, যাতে তাঁরা আগামী দিনে সিনেমাজগতের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারেন। মাস্টার ক্লাসের মাধ্যমে এই তরুণ প্রতিভাদের উৎসাহ প্রদান করা হয়, যা তাঁদের এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে। এই উদ্যোগের অধীনে পরিচালনা, সম্পাদনা, গান ও চিত্রনাট্য রচনা-সহ চলচ্চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য দক্ষতার ভিত্তিতে ৩৫ বছরের কম বয়সি ৭৫ জনকে নির্বাচিত করা হয়, এদের মধ্যে সাতজন মহিলা রয়েছেন। যাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ অংশগ্রহণকারী ছিলেন বিহারের ১৬ বছর বয়সি আর্যকুমার, যাকে চলচ্চিত্র পরিচালনায় দক্ষতার জন্য নির্বাচিত করা হয়। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিশিষ্ট গীতিকার এবং সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন-সিবিএফসিএর চেয়ারম্যান প্রসূন জোশীর প্রতি ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, যিনি '৭৫ ক্রিয়েটিভ মাইন্ডস অফ টুমরো' উদ্যোগের ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব বিভাগে জয়ী হয়েছেন। সবচেয়ে বড় ফিল্ম ফেস্টিভ্যালগুলোর মধ্যে অন্যতম হল আইএফএফআই। আইএফএফআই এশিয়ার প্রাচীনতম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং ভারতের বৃহত্তম চলচ্চিত্র উৎসব হিসেবে বিবেচিত হয়। আইএফএফআই ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফিল্ম প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে অনুমোদিত। এই উৎসবে ভারত ও সারা বিশ্বের সেরা চলচ্চিত্রগুলো প্রদর্শিত হয়।

• এ বছরের আইএফএফআই ৭৩টি দেশ থেকে নির্বাচিত ১৪৮টিরও বেশি বিদেশি চলচ্চিত্রের বৈচিত্র্যপূর্ণ তালিকা-সহ চলচ্চিত্রপ্রেমীদের জন্য একটি অনন্য অভিজ্ঞতা;

• যৌথভাবে সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার জেতে দক্ষিণ আফ্রিকার ছবি 'বরকত' এবং রাশিয়ান ছবি 'দ্য সান অ্যাবোভ মি নেভার সেট'। ব্রাজিলিয়ান চলচ্চিত্র নির্মাতা লুসিয়া মুরাত তাঁর দুর্দান্ত তথ্যচিত্র 'আনা'-র জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার জেতেন;

• ভারতীয় অভিনেতা ধনুশ 'আসুরান' ছবিতে একজন গ্রাম্য কৃষকের চরিত্রের জন্য সেরা অভিনেতার (পুরুষ) পুরস্কার লাভ করেন;

• ব্রাজিলিয়ান অভিনেত্রী লারা বোল্ডা রিনি 'অন হুইলস'-এ তাঁর চরিত্রের জন্য সেরা অভিনেতার (মহিলা) পুরস্কার জিতে নেন। চিনের পরিচালক ইয়ান হান 'এ লিটল রেড ফ্লাওয়ার'-এর জন্য জুরি বিশেষ পুরস্কারলাভ করেন।

বিভিন্ন প্রিমিয়ার

চলচ্চিত্র উৎসবে ১২টি বিশ্ব প্রিমিয়ার, সাতটি আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার, ২৪টি এশিয়ান প্রিমিয়ার ও ৭৪টি ভারতীয় প্রিমিয়ার ছিল। ৭৫টি ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল যার মধ্যে ১৭টি বিশেষভাবে ভারত @৭৫ বিভাগের অধীনে নির্বাচিত হয়। কনভারসেশনও পরিচালিত হয়। মনোজ বাজপেয়ী, হৃতিক রোশন, সুজিত সরকার এবং সিনেমা জগতের আরও অনেক গুণী মানুষ তাঁদের অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন।

• ওটিটি প্ল্যাটফর্মে একসঙ্গে ৫০টিরও বেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছিল। ওটিটি প্ল্যাটফর্মের সহযোগিতায় ১০টি মাস্টারক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

জাপানি ছবি 'রিং ওয়ান্ডারিং' গোল্ডেন পিকক জিতেছে

• জাপানি সিনেমা 'রিং ওয়ান্ডারিং' টোকিওর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অতীতের স্মৃতি ফিরিয়ে এনে ৫২তম আইএফএফআইয়ে গোল্ডেন পিকক জিতে নেয়। চেক পরিচালক বাক্লাভ কাদ্রাঙ্কা 'সেভিং ওয়ান হু ওয়াজ ডেড'-এর জন্য ৫২তম আইএফএফআইয়ে সেরা পরিচালক হিসেবে সিলভার পিকক জিতে নেন।

• ভারতীয় এবং মারাঠি অভিনেতা জিতেন্দ্র ভিকুলাল 'গোদাবরী' ছবিতে প্রয়াত মারাঠি অভিনেতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা নিশিকান্ত কামাতের চরিত্রে অভিনয় করে সেরা অভিনেতা (পুরুষ) হিসেবে সিলভার পিকক পুরস্কারলাভ করেন।

• স্প্যানিশ অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলা মোলিনা শার্লটের ভূমিকার জন্য সেরা অভিনেতা (মহিলা) হিসেবে সিলভার পিকক পুরস্কার লাভ করেন।

• মারাঠি পরিচালক নিখিল মহাজনের 'গোদাবরী' বিশেষ জুরি পুরস্কারের জন্য সিলভার পিকক জেতে। তিনি রেনাটা কারভালহারের সঙ্গে যৌথভাবে পুরস্কারটি ভাগ করে নেন, পরিচালক রদ্রিগো ডি অলিভেইরার 'দ্য ফাস্ট ফলেন' চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন এই ব্রাজিলিয়ান অভিনেত্রী।

• ১৯৮৪ সালের ইউএসএসআর-এর সময়ে জটিল ও দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার জন্য রাশিয়ান পরিচালক রামোন ভাসিয়ানভের 'দ্য ডিওআরএম' বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুরস্কারলাভ করে।

• পরিচালক মারি আলেসান্দ্রিনির ছবি 'জহোরি' সেরা ফিচার ফিল্মের জন্য ৫২তম আইএফএফআই পুরস্কার জিতে নেয়। প্রথম আত্মপ্রকাশকারী পরিচালক সাইমন ফারিওলের স্প্যানিশ চলচ্চিত্র 'দ্য ওয়েলথ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' ৫২তম আইএফএফআইয়ে 'ডেবিউ প্রতিযোগিতা' বিভাগে বিশেষ উল্লেখ্য পুরস্কার পেয়েছে।

• 'লিঙ্গুই– দ্য স্যাক্রেড বন্ডস' ৫২তম আইএফএফআইয়ে আইসিএফটি-ইউনেস্কো গান্ধী পদক জিতে নেয়। আন্তর্জাতিকভাবে সহ-প্রযোজিত এই চলচ্চিত্রটি মহিলাদের সংগ্রামের ও মানবতার এক অনবদ্য উপাখ্যান তুলে ধরে। সূত্র: নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস

জন্ম ১৬ জানুয়ারি ১৯১০ ॥ মৃত্যু ৪ আগস্ট ১৯৩১

'ফাঁসির মঞ্চে যারা গেয়ে গেল জীবনের জয়গান', সত্যিই ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে যে কত প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে, তা আমাদের এখনও ঠিক জানা নেই। এমনই এক বিপ্লবীর কথা বলব এখানে। তাঁর নাম হল রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের জন্ম হয় ১৬ জানুয়ারি ১৯১০ সালে চট্টগ্রামের সারোয়াতলীতে। তাঁর পিতার নাম ছিল দুর্গাকৃপা বিশ্বাস। পড়াশোনায় ছিলেন তিনি সহপাঠীদের মধ্যে অদ্বিতীয়। ডিভিশনাল স্কলারশিপ পেয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেন। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সময় রামকৃষ্ণ ছিলেন কলেজের ইন্টারমিডিয়েটের শ্রেষ্ঠ ছাত্র।

কলেজে ভর্তি হওয়ার পর তিনি কলেজের প্রফেসারদের প্রিয় ছাত্র। রামকৃষ্ণকে তারা কলেজের মূল্যবান সম্পদ মনে করেন।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ছিলেন গোপন বিপ্লবী দলের সদস্য। দলের শ্রেষ্ঠ কর্মী ও সংগঠকদের মধ্যে তিনিও একজন। রামকৃষ্ণ বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র ছিলেন বলে বোমা তৈরির গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব তার ওপর পড়ে, সালটা ১৯৩০। একদিন শহরের একটি বাড়িতে রামকৃষ্ণ গোপনে পিকরিক পাউডার তৈরি করার সময় সেটা ফেটে যায় আর বোমা বিস্ফোরকের ফলে তার বিভিন্ন শরীরের স্থান পুড়ে যায়। সেখান থেকে সরিয়ে রামকৃষ্ণকে অন্য জায়গায় রাখা হয়। তখন তিনি অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের নেতা সূর্য সেনের বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তীর পরিকল্পনা বাংলার ইন্সপেক্টর জেনারেল ক্রেগকে হত্যা করতে হবে। কারণ ১৯৩০ সালে টি জে ক্রেগ বাংলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ পদে নতুন দায়িত্ব নিয়ে চট্টগ্রাম সফরে আসেন। জেনারেল ক্রেগকে হত্যার দায়িত্ব দেন মাস্টারদা সূর্য সেন এবং একাজে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তীকে নিযুক্ত করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১ ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে বিপ্লবীরা চাঁদপুর রেলস্টেশনে রিভলবার নিয়ে আক্রমণ চালান কিন্তু ভুল করে তাঁরা মি. ক্রেগের পরিবর্তে চাঁদপুরের এসডিও তারিণী মুখার্জিকে হত্যা করেন।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তীকে সেদিনেই পুলিশ বোমা আর রিভলবারসহ গ্রেপ্তার করে। এই বোমাগুলোই কলকাতা থেকে মনোরঞ্জন রায় চট্টগ্রামে নিয়ে আসেন। তারিণী মুখার্জি হত্যা মামলার রায়ে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের মৃত্যুদণ্ড এবং কালীপদ চক্রবর্তীকে নির্বাসন দণ্ড দেয়া হয়। গ্রেপ্তারের পরেও রামকৃষ্ণের সংগ্রামের ক্ষুধা দমিত হয়নি। তিনি মনে মনে স্থির করেন যে বিচারপতি স্টিভেন্সকে সুযোগ বুঝে আক্রমণ করবেন, কিন্তু ঠিক সময় অস্ত্র না পাওয়ায় সে-কাজে সফল হতে পারেননি। জেলে রামকৃষ্ণের ওপর কড়া নিরাপত্তা থাকায় কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারতেন না। তাঁর বন্ধু কালীপদও বন্দী, কোনওরকম রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেন। একদিন এমনি সাক্ষাতের সময় কালীপদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা একা একা তুই সময় কাটাস কীভাবে?' রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'আমি বই পড়ে সময় কাটাই, এই কয়মাসে প্রায় একটা লাইব্রেরির বই পড়া শেষ করে দিয়েছি। পৃথিবীতে জানার অনেক কিছু ছিল, জানতাম না। এখন জেনে খুব ভাল লাগল।'

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির কয়েকদিন আগে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার মাঝে মাঝে আলিপুর জেলে গিয়ে দেখা করতেন– ভগ্নীর ছদ্ম পরিচয়ে। সেই দেখা সাক্ষাতের ভিতর দিয়ে প্রীতিলতা, রামকৃষ্ণের কাছ থেকে যে প্রেরণা পেয়েছিলেন তার গভীর রেখাপাত আমরা দেখতে পাই এই নারী বিপ্লবীর পরবর্তী জীবনে। অবশেষে একদিন রামকৃষ্ণের স্বল্পস্থায়ী জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় তখনও রাত্রির অন্ধকার ঘোচেনি। চারদিক নিস্তব্ধ– এমন সময় প্রহরী এসে সেল খুলল। একদল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা লাইন করে দাড়িয়ে আছে তার সেলের সামনে। সেল খোলার অর্থ বুঝতে দেরি হল না রামকৃষ্ণের।

রামকৃষ্ণ তখন অসুস্থ– ১০২° জ্বর চলছে। সেই জ্বর নিয়েই তিনি ফাঁসির মঞ্চে উঠে গেলেন। রামকৃষ্ণের মুখে ধ্বনিত হল 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র। তার এই অভয়বাণী শুনতে পেলেন আলিপুর জেলের সমস্ত বন্দী। সেদিনের তারিখ ছিল ৪ আগস্ট ১৯৩১ সাল। ফাঁসির মঞ্চে শহীদ হলেন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। আলিপুর জেলে রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক সমস্ত বন্দীদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল শহীদ রামকৃষ্ণের বিজয়ধ্বনি। সমস্ত জেলখানা প্রকম্পিত করে মুহূর্তে ধ্বনিত হতে লাগল: 'বন্দেমাতরম', 'রামকৃষ্ণের জয়'। এই ঘটনা প্রীতিলতার জীবনে এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। তাঁর ভাষায় 'রামকৃষ্ণদার ফাঁসির পর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সরাসরি যুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা আমার অনেক বেড়ে গেল।'

• বিশেষ প্রতিবেদন

আচ্ছা, বলুন তো?

উত্তর:

১. ক, ২. ঘ, ৩. খ, ৪. ক, ৫. গ, ৬. ক, ৭. খ, ৮. খ, ৯. ঘ, ১০. ঘ, ১১. ঘ, ১২. ঘ, ১৩. গ, ১৪. খ, ১৫. গ, ১৬. ক, ১৭. গ, ১৮. খ, ১৯. খ, ২০. ক, ২১. ঘ, ২২. ঘ, ২৩. গ, ২৪. ঘ

আপনার মতামত জানান

যোগাযোগের ঠিকানা ও ই-মেল :
ফোন: ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯
এক্সটেনশন: ১২৩৯
inf4.dhaka@mea.gov.in

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশীদার
হাই কমিশনার শ্রী বিক্রমকুমার দোরাইস্বামী এবং বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক স্টার্টআপ, বিটুবি প্লাটফরম্ ক্ষেত্রে সংযোগ বিষয়ে আলোচনা করেন। হাই কমিশনার সাইবার নিরাপত্তা, ফিনটেক সলিউশনের মত গুরুত্বপূর্ণ দুই ক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশ সহযোগিতা করতে পারে বলে মন্তব্য করেন। বৈঠকে বাংলাদেশের ৬টি জেলায় ৬টি বাংলাদেশ-ভারত ডিজিটাল সার্ভিস এমপ্লয়মেন্ট এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (বিডিসেট)-এর জন্য হার্ডওয়্যার সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ চুক্তি এবং ১২টি আইটি/হাই-টেক পার্ক-এর ৮টির নির্মাণ চুক্তি সম্পাদিত হয়

১৯ জানুয়ারি ২০২২ হাই কমিশনার শ্রী বিক্রমকুমার দোরাইস্বামী ভারত-বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি (আইবিসিসিআই)-র সভাপতি জনাব আবদুল মাতলুব আহমেদ ও বোর্ডের অন্য সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ২০২২ অর্থবছরে আইবিসিসিআই-এর নতুন দলকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনা করেন। হাই কমিশনার প্রবৃদ্ধি বহুমুখী করার ক্ষেত্রে সিমবিহীন সংযুক্তি ও সহজতর বাণিজ্য প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন

হাই কমিশনার শ্রী বিক্রমকুমার দোরাইস্বামী ভারতের প্রথম ভার্চুয়াল মসলা বাণিজ্য প্লাটফরম্ 'স্পাইসএক্সচেঞ্জ' (SpiceXchange)-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। এ ভার্চুয়াল মসলা বাণিজ্য প্লাটফরমের উদ্বোধন করেন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী শ্রী সোমপ্রকাশ। ভারতব্যাপী এ অনন্য ত্রিমাত্রিক 'স্পাইসএক্সচেঞ্জ' সারা বিশ্বে ভারতের ২২৫টির বেশি মসলার রফতানি প্রসারে সাহায্য করবে

১৮ জানুয়ারি ২০২২ ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অংশীদারিত্ব প্রসারের লক্ষে হাই কমিশনার শ্রী বিক্রমকুমার দোরাইস্বামী বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন (এফবিসিসিআই)-এর সভাপতি জনাব জসীম উদ্দিন এবং ফেডারেশনের অন্য সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনা করেন। হাই কমিশনার প্রবৃদ্ধি বহুমুখী করার ক্ষেত্রে সিমবিহীন সংযুক্তি ও সহজতর বাণিজ্য প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন

২৯ জানুয়ারি ২০২২ ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে জামালপুর গান্ধী আশ্রমকে অ্যাম্বুলেন্স প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অ্যাম্বুলেন্স-এর চাবি হস্তান্তর করেন ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের প্রজেক্ট ও এস্টাব্লিশমেন্ট বিভাগের দ্বিতীয় সচিব শ্রী সঞ্জয় জৈন। অনুষ্ঠানে জামালপুর গান্ধী আশ্রমের পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন

Regd. No. DA 355, Bharat Bichitra, January, 2022

দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড